

ପରୀକ୍ଷିତ ସାମାଜିକ

ଗଣ

লুপ আলফ্রেড নোয়েস
হ্যান্ডশেক স্টিফেন কিং
নিউটনের বন্ধু বাণী বসু
ফিবোনাচি রবার্ট সিলভারবার্গ
ধর্মক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত
আকিলিস বনফুল
হারমোনিয়াম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শঙ্কর শেষ অবস্থা সত্যজিৎ রায়
আর সালান সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
যাত্রী শংকর

এই গল্পগুলো লেখার উদ্দেশ্য দুটো

১) আমার প্রিয় লেখকদের অনুকরণ করে খানিক হাত মকশো করা; যদিও স্থান কাল পাত্র সবই একালের, আমি এই লেখকদের 'স্টাইল' টাকে যতদূর সম্ভব অবলম্বন করার চেষ্টা করেছি।

২) বাংলা সাহিত্য 'bizarre', 'অদ্ভুতুড়ে' বা কল্পবিজ্ঞানের ধারাটাকে বাঁচিয়ে রাখা।

আমার টার্গেট অডিয়েন্স মুখ্যত কিশোর। আমি নিজে যে সমস্ত অসাধারণ সাহিত্যিকের হাতে বড় হয়েছি, তাদের স্বাদ আমার পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়ার চেষ্টা।

লুপ

আলফ্রেড নোয়েস

রূপালী রঙের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা কালো ছবি । হাসি হাসি মুখ করে স্টুডিওর টেবিলের ধারে অনীশ । সাত বছর বয়সে তোলা । এই বাইশ বছরে ছবিটা খানিক ফিকে হয়ে এসেছে । তবু অনীশের স্টাডি টেবিলেই রাখা থাকে ।

অনীশ চক্রবর্তি সেকটর ফাইভের চাকুরে । ভিজিটিং কার্ডে লেখা থাকে 'ডেভেলপার' । মোটামুটি নটা-পাঁচটার চাকরিই বলা যায় । অফিস আর বাড়ির চক্রে অনীশের জীবন আবর্তিত হয় । রোজই চেনা পথে চেনা অফিসে যাতায়াত । অনীশের কাজের ধরনটাও মোটামুটি বাঁধা । গড়ে প্রতি তিন মাসে নতুন প্রোজেক্ট আসে, অনীশও চেনা ছকে চেনা প্রোগ্রাম লিখতে থাকে । ট্রেনের টিকিট বুক করা, ব্যাঙ্কের পাসবই আপডেট করা, টেলিফোন বিল বানানো, এমনি নানা ধরনের সফটওয়্যার । মোটের ওপর অনীশের প্রতিটা দিনই প্রায় একরকম । মাইনে খারাপ নয়, ক্লাবে আর রেস্টুরেন্টে উড়িয়েও যে টাকা বাঁচে তাতেও যথেষ্ট । তাছাড়া অনীশের নেশা বলতে কিছু নেই, ঘোরাঘুরির শখ নেই, অতিরিক্ত খরচ বলতে খালি নতুন নতুন সায়েন্স ফিকশন নভেল কেনা । অনীশের বাবা গত হয়েছেন প্রায় দুবছর হতে চলল, আগরপাড়ার ফ্ল্যাটে শুধু অনীশ আর তার মা ।

মারোমারো চাকরির এই আবর্তে অনীশের বন্ধ লাগে । অনীশের স্বপ্ন সে একদিন এমন এক প্রোগ্রাম লিখবে যা তথাকথিত 'বুদ্ধিমান' হবে, অর্থাৎ 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' । এ নিয়ে অনীশ পড়াশোনাও করেছে প্রচুর । কিন্তু অফিসের কাজ করে অন্য দিকে নজর দেওয়ার সময় পায়না অনীশ ।

আজ বহুক্ষণ ধরে অনীশ একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আটকে আছে । চার লাইনের একটা কোড, যতবার রান করছে ততবারই মাঝপথে হ্যাং হয়ে যাচ্ছে । আধঘন্টা কি-বোর্ডের সাথে ধস্তাধস্তি করে শান্ত অনীশ ডেস্ক ছেড়ে উঠে কফি মেশিনের দিকে পা বাড়াল । ছোট একটা জটলা কফি মেশিনের ধারে লেগেই থাকে ।

কনক অনীশের পাশের খোপে বসে । অনীশকে কাপ নিতে দেখে বলল - “আজ এই নিয়ে চার কাপ কফি হয়ে গেল তোর, খুব ব্রেন লাগাচ্ছিস মনে হচ্ছে ! বেশি চাপ নিসনা, মেশিন গরম হয়ে গেলে বিপদ । ”

চার কাপ ? অনীশের কি স্মৃতিভ্রম হল? আজ অফিসে ঢোকানোর পর এই প্রথম কফি মেশিনের ধারেকাছে এল অনীশ ।

ব্যাপারটাকে তখনই আমল না দিয়ে অনীশ কাপে কফি ভরতে ভরতে বলল - “একটা লুপ এ আটকে যাচ্ছি। কিছুতেই প্রোগ্রাম রান করছে না । কোথাও লজিকে গোলমাল হচ্ছে ।”

“ইনফিনিট লুপ করে দিসনি তো ? লুপের কন্ডিশন চেক কর । খুব অ্যামেচারিশ আর কমন্ প্রবলেম । নিশ্চয়ই তোর লুপের কন্ডিশন এমন রেখেছিস যে প্রোগ্রাম কখনো শেষ হবেনা, চলতেই থাকবে ।”

কথাটা অনীশের মাথাতেও ঘুরছিল, কিন্তু অনেকবার চেক করেও অনীশ কন্ডিশনে ভুল ধরতে পারেনি । আরও খানিকক্ষণ পড়ে থাকতে হবে ওই চার লাইন নিয়ে । ভাবতেই অনীশের মন খারাপ হয়ে গেল। সাড়ে পাঁচটা বাজে, আজও বাড়ি ফিরতে রাত হবে ।

কফির কাপ নিয়ে ডেস্কে ফিরতেই ব্যাপারটা অনীশের নজরে পড়ল । ল্যামিনেশন করা ডেস্কের ওপর তিনটে কফির কাপের ছাপ ।

প্রোগ্রাম শেষ না করেই সেদিন বাড়ি ফিরল অনীশ ।

সেদিন ফিরে অনীশের কিছুতেই বাড়িতে মন বসলনা । সন্কে সাড়ে আটটার সময় অনীশ পাড়ার ক্লাবে গেল । চার পাঁচজন মিলে খুকুমার ক্যারম চলছে । অনীশকে অনেকদিন বাদে পেয়ে তারাও খুশি । কিন্তু ক্যারমেও অনীশ বিশেষ সুবিধে করতে পারলনা । অনেকদিনের অনভ্যাস । তাছাড়া অনীশের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সে একই গুটি তিন চারবার করে খেলছে ।

রাতে খাবার অনীশের মুখে রুচলনা । ক্রমাগতই কফির কাপটা মাথায় ঘুরছিল। অনীশের পরিবারে কারোর ভীমরতি হয়েছিল বলে অনীশের জানা নেই । রিডার্স ডাইজেস্টে একবার পড়েছিল, ছোট ছোট স্মৃতিভ্রমই নাকি অ্যালজহাইমার'স ডিজিজ এর প্রথম লক্ষণ ।

অনীশের কি তাই হল নাকি ? এত কম বয়সে কি কারো ওসব হয় ? অনীশ ভাবনাটাকে মাথা থেকে বের করে দিল । ভাল ঘুম দরকার, ওই চার লাইন নিয়ে কাল আবার সারাদিন খাটতে হবে ।

বিছানায় শুতে যাবার আগে শোকেসে রাখা ছবিটার দিকে চোখ পড়ে গেল অনীশের । ছবিটা কি আগের থেকে একটু আলাদা লাগছে ? অনীশ কাছে গিয়ে ছবিটাকে খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল । ছবিতে যে টেবিলটার পাশে অনীশ দাঁড়িয়ে, সেটা যেন একটু স্পষ্ট লাগছে । তার ওপরে কিছু একটা রাখা আছে তাও বোঝা যাচ্ছে । কিন্তু জিনিসটা কি সেটা অস্পষ্ট । অনীশ ছবিটাকে ফ্রেম থেকে বার করে ভাল করে মুছল । কিন্তু টেবিলের ওপর কি সেটা বোঝা গেলনা ।

পরেরদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েই অনীশের একটা খটকা লাগল । একটা সাদা কালো ডোরাকাটা বেড়াল গৌফ ফুলিয়ে গেটের সামনে ঘুরছে ।

অনীশ হলফ করে বলতে পারে ওই একই বেড়াল, গতকাল ওই একই জায়গায় একই রকম মুখ করে দাঁড়িয়েছিল ।

অফিসের তাড়ায় অনীশের বেশিক্ষণ এই নিয়ে ভাবার সময় হলনা । কিন্তু অটোয় উঠতে গিয়ে অনীশ আবার একটা ধাক্কা খেল ।

গতকাল যেটায় উঠেছিল, অবিকল সেই অটো, সেই ড্রাইভার, সেই বাঁদিকে ভাঙ্গা লাইট, সামনের চাকায় লাগানো রংবেরঙ্গের ঝালর। যেন অনীশের অবচেতন থেকে উঠে এসেছে এই অটো ।

অফিসে অবশ্য আরো বড় চমক অপেক্ষা করছিল ।

গতকাল অনীশ যে বাইশ লাইন লিখেছিল, প্রোগ্রাম থেকে সেই কটা লাইন কেউ মুছে দিয়েছে । আবার শুরু থেকে কাজ করতে হবে ।

ব্যাপারটা এতটাই অপ্রত্যাশিত যে অনীশ খানিকক্ষণ চিত্তাৰ্পিতের মত বসেই রইল । কাজ শুরু করতেই খানিক সময় লেগে গেল অনীশের । কতক্ষণ প্রোগ্রাম নিয়ে বস আছে অনীশের মনে নেই, হঠাৎ পাশের খোপ থেকে কনকের আওয়াজ ভেসে এল - “রবিবাবু,

এই দু হাজার চোদ্দ সালে বসে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের মত কমিউনালিজম প্রচার করবেননা । ওয়ার্ল্ড কাপে তো পাত্তা পাবেননা, খালি কলকাতার ফুটবল নিয়ে সেন্টিবাজি ।”

কথাটা এতই চোঁচিয়ে বলা যে অনীশের কানে বাজল । সাথেসাথে অনীশের এটাও মনে হল, এই জাতীয় একটা আলোচনা নিয়ে গতকালও কনক অফিস গরম করেছে ।

শুধু তাই নয়, একজাক্টলি এই কথাটাই এইভাবে চোঁচিয়ে বলেছিল ।

অনীশ পাঁড় ইস্টবেঙ্গল । গতকাল নিজের খোপ থেকে চোঁচিয়ে এর একটা জুতসই জবাবও দিয়েছিল অনীশ ।

“তোদের তো চার বছর তো কলকাতা লিগটাও হাতের বাইরে, আবার ওয়ার্ল্ড কাপের স্বপ্ন !”

কথাটা বলেই মুখ চেপে ধরল অনীশ । যদিও তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে, তবুও অনীশ শপথ করে বলতে পারে, কথাটা সে বলেনি । অন্তত আজ বলেনি । গতকালের জবাবটাই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ।

গতকাল কি জবাব দিয়েছিল সেটা মনে পড়ার আগেই ।

এবং এর উত্তরে কনক কি বলবে সেটাও অনীশের জানা ।

“রেফারি ম্যানেজ করে তো চালাচ্ছিস, বেশি মুখ খোলাসনা !” কনকের স্বর যেন দৈববাণীর মত শোনালা ।

অনীশের মুখ থেকে আবার একটা উত্তর বেরিয়ে আসার আগেই টেবিলে রাখা জলের বোতলটা তুলে নিয়ে অনীশ ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে নিল ।

না, কনক আর কোন কথা বলছেননা । অফিসে এসির মৃদু গর্জন ছাড়া শুধু নৈশব্দ্য ।

ঠিক কালকের মত ।

যে চার লাইন নিয়ে সমস্যা ছিল, আজও তাতেই আটকে গেল অনীশ । অনেকক্ষণ লেগে থাকার পরেও কন্ডিশনাল লজিকে কোথায় ভুল হচ্ছে ধরা গেলনা । প্রোগ্রাম হ্যাং হতেই থাকল । বারো তেরবার এই একই জায়গায় আটকে যাওয়ার পরে হাল ছেড়ে দিয়ে অনীশ

কফি খেতে উঠল ।

আজও কফি মেশিনের ধারে কনক । অনীশকে কাপ নিতে দেখে বলল - “আজ এই নিয়ে চার কাপ কফি হয়ে গেল তোর, খুব ব্রেন লাগাচ্ছিস মনে হচ্ছে ! বেশি চাপ নিসনা, মেশিন গরম হয়ে গেলে বিপদ । ”

চার কাপ ? অনীশের কি স্মৃতিভ্রম হল? আজ অফিসে ঢোকানোর পর এই প্রথম কফি মেশিনের ধারেকাছে এল অনীশ ।

ব্যাপারটাকে তখনই আমল না দিয়ে অনীশ কাপে কফি ভরতে ভরতে বলল - “একটা লুপ এ আটকে যাচ্ছি। কিছুতেই প্রোগ্রাম রান করছে না । কোথাও লজিকে গোলমাল হচ্ছে ।”

“ইনফিনিট লুপ করে দিসনি তো ? লুপের কন্ডিশন চেক কর । খুব অ্যামেচারিশ আর কমন্ প্রবলেম । নিশ্চয়ই তোর লুপের কন্ডিশন এমন রেখেছিস যে প্রোগ্রাম কখনো শেষ হবে না, চলতেই থাকবে ।”

অনীশ হঠাৎ টের পেল, এই এয়ার কন্ডিশনড অফিসেও তার কলার ঘামে ভিজ়ে উঠেছে । খুব আস্তে আস্তে অনীশ নিজের খোপে ফিরে এল । সাবধানে ব্যাগটাকে ডেস্ক থেকে তুলে নিল, খুব সতর্ক হয়ে, যাতে ডেস্কের দিকে নজর না পড়ে যায় । তারপর কেউ লক্ষ্য করার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেল । প্রোগ্রাম শেষ না করেই ।

ঠিক তখনই যদি কেউ অনীশের ডেস্কের দিক তাকাত, তাহলে তিনটে কফির কাপের ছাপ অবশ্যই দেখতে পেত ।

রাতে নিজের ঘরে ফিরে অনীশ বিছানায় গা এলিয়ে দিল । আজকের সারাদিনটা এখনো দুঃস্বপ্নের মত চোখে ভাসছে ।

তখনই আবার শোকেসে রাখা ছবিটা অনীশের চোখে পড়ল । আরো স্পষ্ট, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ছবিটা ।

অনীশ ফ্রেম থেকে বার করে ছবিটাকে কাছে নিয়ে দেখল । ছবিতে টেবিলের ওপর কি রাখা আছে খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ।

আরেকটা ছবি ।

সেটার ফ্রেম রূপালী । তার ভিতরে একটা সাত আট বছরের ছেলে হাসি হাসি মুখ করে
দাঁড়িয়ে আছে ।

ছেলেটা যে সাত বছরের অনীশ তাতে কোন সন্দেহই নেই ।

এবং সেই ছেলেটার পাশেও একটা টেবিল । তার ওপরে একটা ছবি ।

আর সেই ছবিটার ভিতরে কি আছে, তা অনীশের জানা ।

অনীশ এবার নিশ্চিত হয়ে বালিশে মাথা গুঁজে দিল । আর কিছু ভাবনার নেই । আগামীকাল
কেমন কাটবে অনীশের জানা ।

খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই জানা ।

রূপালী রঙের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা কালো ছবি । হাসি হাসি মুখ করে স্টুডিওর টেবিলের
ধারে অনীশ । সাত বছর বয়সে তোলা ...

হ্যা ভ শে ক সিটফেন কিং

অনেকক্ষণ ধরেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, তারিণীখুড়ো ক্লাবঘরে ঢুকতেই বামবাম করে আরম্ভ হল। ছাতাটা এককোণে রাখতে রাখতে খুড়ো বললেন - “বেশি ভিজিনি বল ! যা একখানা ভাল করে এলাচ দিয়ে চা বানা। তারপর, কি খবর তোদের ? মারাদোনার যুগ তো গেল, এবার নতুন আইডল আমদানী করেছিস শুনছি ! এসপ্ল্যান্ড ইস্ট দেখলাম বিশাল ভিড়, কলকাতায় মাসি এসেছে।”

“মাসি নয়, মেসি।” - অরুণের সংশোধন।

“ওই হল। মেসি নামে আরো একজন ছিল, জানিনা তোরা তার নাম শুনেছিস কিনা। বব মেসি, কেউ কেউ য-ফলা লাগিয়ে বলত ম্যাসি। আমরা অবশ্য তখনও মাসিই বলতাম। তাছাড়া ইয়ান বোতাম, ম্যালকম মার শা...”

তারিণীখুড়োর কথা শেষ না হতে হতেই রঞ্জন ছড়মুড়িয়ে ঢুকে ঘোষণা করল - “মেসির সাথে হ্যাভশেক করে এলাম।”

কথাটার আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া হলনা। আমি বললাম - “হ্যা, আর আমি তো রোনাল্ডোকে ফাউল করে বেঞ্চে বসে আছি। মেসির চারধারে চারশো পুলিশ টপকে একা তুই ই হ্যাভশেক করতে পেলি।”

“মাঠে ঢোকার আগেই সেরে ফেলেছি, বুঝলি” - রঞ্জনের গর্বিত জবাব - “যুবভারতীর টানেলে। তক্কে তক্কে ছিলাম। এই দেখ সেই হাত !” - নিজের ডানহাত মেলে ধরল রঞ্জন। ভজু আর পিন্টু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর হাতের ওপর।

ঠিক তখনই তারিণীখুড়ো বললেন - “হাত মেলানোর সুযোগ আমরা একবার এসেছিল। ভাগ্যিস করিনি।”

ভজু বলল - “কার সাথে?”

ন্যাপলা চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরাও গ্যাট হয়ে বসলাম। একটা

আরামের চুমুক দিয়ে খুড়ো শুরু করলেন -

“আমি তখন লক্ষ্মীতে একটা প্রাইভেট ব্যাঙ্কে চাকরি করি। বলতে গেলে নির্বাঙ্ঘাট জীবন। দশটা পাঁচটার চাকরি আর সন্কেবেলায় অফিসের ক্লাবে আড্ডা, এই তখন আমার লাইফ। ক্লাবের এককোণে বসত আমাদের তাসের আড্ডা। ওমপ্রকাশ, বাটিবাবু, রাকেশ আর আমি ছিলাম কার্ডস ক্লাবের লাইফ মেম্বার। অস্বীকার করবনা, তখন বাজি রেখে খেলার নেশা আমায় পেয়ে বসেছিল, এবং তাসের টেবিল থেকে আমার মাঝে মাঝে কিছু আয়ও হত। তবে নেশাটা কখনো মাত্রা ছাড়ায়নি।

এখন এই বাটিবাবু সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বাটিবাবুর আসল নাম আমার জানা ছিলনা, ক্যাশ কাউন্টারে বসতেন, খুচরো পয়াসাগুলো রাখতেন একটা বেশ বড় স্টিলের বাটিতে। বাটিবাবু নামটা আমারই দেওয়া। তাছাড়া ভদ্রলোকের প্রতি কৌতুহলের আরো একটা কারণ ছিল। এমন শুচিবাই আর কারো মধ্যে আমি দেখিনি। ক্যাশ কাউন্টারের বাইরে সবসময় হাতে গ্লাভস। কড়া নিয়ম ছিল, কোন অবস্থাতেই তাকে ছোঁয়া যাবেনা। মানুষের স্পর্শের প্রতি এমন চরম অনীহা বিরল। জনশ্রুতি ছিল, তাকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। আমাদের তিনজন ছাড়া কারো সাথে তিনি বড় একটা কথাও বলতেননা।

যে দিনের কথা বলছি, তখন খেলা বেশ জমে উঠেছে। দশ বিশ টাকা থেকে উঠতে উঠতে খেলা চারশোয় উঠেছে। মনে রাখিস এটা সত্তর দশকের শুরু, তখনও কলকাতার ফুটে এক টাকায় ভরপেট খাবার পাওয়া যেত। ওমপ্রকাশ অনেক আগেই হাত তুলে নিয়েছে। সেদিন মাইনের দিন ছিল, পকেটে নতুন নোট কড়কড় করছে বলে আমিও অনেকক্ষণ টেনেছিলাম, কিন্তু আমরা রেস্তা ফুরিয়ে আসছিল। যখন রাকেশ ফাইনালি সাড়ে পাঁচশো হাকল, আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টেবিলে তাস ছেড়ে দিয়ে বাটিবাবুর দিকে তাকালাম।

আমার ধারণা ছিল বাটিবাবু এখানেই খেলার ইতি করবেন। কিন্তু আমাদের তিনজনকেই অবাক করে দিয়ে বাটিবাবু বললেন - “আটশো!”

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে বাটিবাবু ও রাকেশের মধ্যে একটা চাপা রেযারেযি

ছিল। কোন একটা প্রমোশনের ব্যাপারে বাটিবাবুর অনেক জুনিয়র রাকেশ তাকে টপকে এগিয়ে গেছিল। কারণে হোক আর অকারণেই হোক, বাটিবাবু মাঝেমাঝেই আকারে ইঙ্গিতে রাকেশের প্রতি তার মনোভাব বুঝিয়ে দিতেন।

আজ বাটিবাবুর কল শুনে রাকেশ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। তাদের দুজনের সংঘাতটা যে বাটিবাবু এইভাবে প্রকাশ্যে এনে ফেলবেন, এটা বোধহয় সেও ভাবতে পারেনি।

“বারশো।”

আজ মাইনের দিন হলেও অঙ্কটা যে বাটিবাবুর সাধ্যের বাইরে সেটা আমরা জানতাম।

বাটিবাবুর দিকে তাকালাম। তার চোখ আগুনের মত জ্বলছে।

আমি রাকেশকে বোঝাতে গেলাম - “রাকেশ, এবার কিন্তু অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। খেলা আটশোয় শেষ কর। কেন...”

আমার কথা শেষ করতে পারলামনা। বাটিবাবু তার ডান হাতের গ্লাভস খুলে ফেলছেন।

“আমার এই আংটি আশা করি পাঁচশো টাকার কম হবেনা।” - একটা চুনী বসানো আংটি খুলে বাটিবাবু টেবিলে রাখলেন।

আমি আর ওমপ্রকাশ দুজনেই রাগত চোখে রাকেশের দিকে তাকালাম। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে রাকেশ বলল - “বাটিবাবু, ইয়ার দোস্তের মধ্যে খেলা, আমরা কেউ জুয়াড়ি নই। খেলা শেষ, আপনার আংটি তুলে নিন।”

বাটিবাবু রাকেশের দিকে সেভাবেই চেয়ে আছেন।

রাকেশ এবার বাটিবাবুর ডান হাত ধরে আংটিটা তাতে রেখে মুঠি বন্ধ করে দিল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্লাবের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

বাটিবাবু দরজার দিকে চেয়ে আছেন।

আমি আর ওমপ্রকাশ টেবিল ছেড়ে উঠলাম। ওমপ্রকাশ প্রথমে বেরিয়ে গেল। বাটিবাবু বসে রইলেন।

আমি দরজা ঠেলে বেরনোর আগে একবার বাটিবাবুকে ফিরে দেখলাম। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে বাটিবাবু তাকিয়ে আছেন।

ডানহাতে শক্ত করে চেপে ধরে আছেন তার খুলে রাখা গ্লাভস ।

পরেরদিন সকালে অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই দুঃসংবাদ । রাকেশ গতকাল রাতে ঘুমের মধ্যেই মারা গেছে । ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক, কিন্তু রাকেশের পরিবারের কেউ সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নয় । যদিও প্রাথমিক পরীক্ষায় রাকেশের শরীরে আঘাত বা বিষক্রিয়া কোনটারই চিহ্ন পাওয়া যায়নি ।

কিন্তু এছাড়া আরো একটা ঘটনা আমায় বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল ।

বাটিবাবু কামাই করেছেন ।

আমার দেখা প্রথমবার । ওমপ্রকাশ সাত বছরের চাকুরে, বাটিবাবুকে ফ্রেঞ্চ লিভ নিতে সেও প্রথম দেখছে ।

একটা সন্দেহ আমাদের দুজনের মনেই দানা বাঁধছিল । সাড়ে চারটে বাজতেই আমরা দুজন বাটিবাবুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম । আমিনাবাদের ঘিঞ্জি গলিতে বাটিবাবুর বাসস্থান খুঁজে পেত বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল । নবাবী আমলের ভগ্নপ্রায় বাড়ি, তার এককোণে ছোট একটা ঘরে বাটিবাবুর আবাস ।

দরজায় আলতো চাপ দিতেই খুলে গেল । প্রায় নিরাভরণ ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলে চেয়ারের উপর বাটিবাবু স্থির হয়ে বসে আছেন । আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেননা, আমরা যেন অদৃশ্য ।

“আজ হঠাৎ অফিস কামাই করলেন যে” - ওমপ্রকাশই সাহস করে কথা শুরু করল ।

বাটিবাবু এবার আমাদের দিকে তাকালেন । সে দৃষ্টির বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই । শুধু মনে হল যেন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত জমে বরফ হয় গিয়েছে ।

“তোমাদের মনে হয় আমি রাকেশকে খুন করেছি !”

এর উত্তরে কি বলা উচিত তা ঠিক করার আগেই বাটিবাবু দ্বিতীয়বার মুখ খুললেন ।

“তোমাদের এই ধারণা সত্যি ।”

দেওয়ালের ওপর বাটিবাবুর দীর্ঘ ছায়া মোমের আলোর সাথে সাথে কাঁপছে । বাটিবাবু শুরু করলেন -

“তোমরা জানোনা, কিন্তু আজ থেকে বারো বছর আগে আমি ইউ পি পুলিশে কনস্টেবল ছিলাম। আমার পোস্টিং ছিল এলাহাবাদ থেকে ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। জায়গাটার পরিস্থিতি ভাল ছিলনা, খুন খারাপি লেগেই থাকত। আমাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল ব্রিটিশ আমলের গাদা বন্দুক। তাই নিয়েই বেরিয়ে পড়তাম।

সে দিনটা আজো আমার চোখে ভাসে। গ্রামের মাটির বাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা বদমাশকে তাড়া করছি। হঠাৎ সে থমকে গিয়ে পিছন ফিরে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালান। দেওয়ালের আড়ালে মুখ ঢাকতে ঢাকতেও লক্ষ্য করলাম, বেটার হাতে একটা মাউজার পিস্তল।

এক্ষেত্রে নিয়ম হল পায়ে গুলি চালানো। কিন্তু রাফেলটা ক্রমাগত গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। আমি দেওয়ালের পিছনে বসে অপেক্ষা করছি, কখন ওর রাউন্ড শেষ হবে।

অবশেষে গুলি চালান বন্ধ হল। খানিকক্ষণ কোন শব্দ নেই। আমি দমবন্ধ করে দেওয়ালের পিছনে বসে আছি। দেওয়ালের পিছন থেকে না ও আমাকে দেখতে পাচ্ছে, না আমি ওকে।

ঠিক কি ভেবে কাজটা করেছিলাম এখন আর মনে নেই, হয়তো উত্তেজনায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, হয়তো আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলামনা। মোটকথা, আমি মাথা বের না করেই দেওয়ালের উপর রাইফেল রেখে ওর দিকে তাক করে গুলি চালিয়ে দিলাম।

প্রথমে একটা বাচ্চার কান্না, তারপরে একটা প্রবল হট্টগোল আরম্ভ হল। আমি ধীরে ধীরে দেওয়ালের ওপর মাথা তুলেই বুঝলাম, কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। বদমাশটা ভেগেছে অনেকক্ষণ, আমার অস্ত্রের মত চালানো গুলিতে মারা গেছে একটা ছাদের রেলিং এর পিছনে লুকিয়ে থাকা একটা বাচ্চা।

আমার ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বুঝতে পারছিলাম, গ্রামের লোকেদের চোখে পড়ে গেলে আমার জীবনসংশয়। অন্ধকারের মধ্যে চাদরে মুখ ঢেকে পালিয়ে এলাম। আমার পুলিশের চাকরিরও সেখানেই ইতি।”

বাটিবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপরে বললেন - “উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে

আইনের হাত পৌঁছয়না । কিছুদিনের মধ্যেই সবকিছু চাপা পড়ে গেল । ভেবেছিলাম ব্যাপারটার শেষ এখানেই । কিন্তু ...”

বাটিবাবুর চোখ কি একটু ভেজা লাগল?

“প্রথমে মারা গেল আমার থানার কনসেটবল দশরথ । তারপর আমার বাড়ির পোষা বেড়ালটা । তারপর আমার স্ত্রী । আমার বাড়ি ফেরার দুদিনের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেল । কিছুদিন আমাকে নিয়ে থানাপুলিশ হল, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় কোন মামলাই হলনা । বিশেষতঃ যখন মৃতদের কারোর শরীরেই আঘাতের কোন চিহ্ন নেই ।”

মোমের আলোয় বাটিবাবুর চোখের কোণের জল চিকচিক করছে ।

“অবশেষে যখন আমার একমাত্র মেয়ে মারা গেল, আমি আসল খুনীকে চিনতে পারলাম ।”

বাটিবাবু তার দু হাত তুলে ধরলেন । মোমের আলোয় দেওয়ালে তাদের ছায়া যেন আরো বিকট মনে হল ।

“সেই বাচ্চাটার অভিশাপ আমি আজো বয়ে বেড়াচ্ছি । ভেবেছিলাম এতদিন পরে বোধহয় এই রাহুর কবল থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি । সেটা যে সত্যি নয়, রাকেশ তার প্রমাণ ।”

ততক্ষণে আমরা খানিক অবচেতন ভাবেই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি । আমাদের যাওয়ার সময় যে হয়ে এসেছে, সেটাও বুঝতে পারছি ।

বাটিবাবু মাথা নুইয়ে মোমের আলোর সামনে বসে আছেন । তার হাতদুটো টেবিলের ওপর রাখা ।

এর পরের দিন সকালে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ভিতরের পাতার কোণের দিকে একটা ছোট খবর ছাপা হল, যা সমস্ত লক্ষ্মীবাসীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ।

“ গতকাল রাতে চারশো বাইশ নম্বর আমিনাবাদ লেনে এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভদ্রলোক আন্দাজ রাত সাড়ে দশটায় পরলোক গমন করিয়াছেন । মৃত্যুকালে তিনি নিজ কক্ষেই চেয়ারে আসীন ছিলেন । আশ্চর্যের বিষয় এই, মৃত ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ

হস্ত দিয়া বাম হস্ত বলপূর্বক ধরিয়া ছিলেন, অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকালে তিনি নিজের সহিত
হ্যান্ডশেক করিতেছিলেন।”

নিউটনের বন্ধু

বাণী বসু

টুবাই অঙ্কে কাঁচা । একথা টুবাইয়ের অঙ্কের টিচার থেকে শুরু করে টুবাইয়ের বাবা মা মাসি পিসি জেঠা কাকা এমন কি পাশের বাড়ির অঞ্জনকাকুও জানে । টুবাইয়ের অঙ্ক ভীতি যেন সারা বাড়িতে একটা ছায়ার মত ঘোরাফেরা করে । বাবার বন্ধুদের সাথে আলোচনায়, মায়ের উলবোনার আড্ডায়, বাড়িতে যেকোন আলোচনার মধ্যেই টুবাইয়ের অঙ্কের সমস্যাটা ঢুকে পড়ে ।

টুবাইয়ের সবচেয়ে বেশি রাগ হয় যখন নিতান্ত অপরিচিত কেউ প্রশ্ন করে - “ও এবার অঙ্কে কত পেল ?” যেন বাংলা ইংরাজি ইতিহাস ভূগোল কোন সাবজেক্টই নয় । অঙ্কে কত নম্বর পেল তাতেই সব ! টুবাইয়ের ক্লাসেও ভাল ছেলে বলে যে কজন নামকরা, তারা সবাই অঙ্কে পচানব্বই প্লাস । অথচ বাংলা আর ইতিহাসে যে টুবাই প্রতিবার টপ করছে, সেটা কেউ চেয়েই দেখেনা । গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত টুবাইয়ের স্কুলে মাসে মাসে পরীক্ষা হয় । অর্থাৎ বছরে বারোবার টুবাইকে মার্কশিট বাবাকে দেখাতে হয় । এবং বহু চেষ্টা করেও অঙ্কের নম্বরটা তার থেকে লুকানো যায়না ।

মাঝেমাঝে টুবাইয়ের মনে হয়, তাহলে বাকি সব সাবজেক্ট ছেড়ে দিয়ে স্কুলে শুধু অঙ্কই করানো হয় না কেন ! সবাই মিলে সারাদিন হিসাব করবে, একটা দেওয়াল রঙ করতে যদি একজন লোকের এক ঘন্টা সময় লাগে, তাহলে বারোজন লোকের বারটা দেওয়াল রঙ করতে কত সময় লাগবে । অথবা একশো বারো টাকার ৪% হিসাবে এক বছরে কত সুদ হবে । টুবাই বুঝতে পারেনা, আলু পটল কমলালেবু আর চায়ের কৌটোর হিসাবকেই কি অঙ্ক বলে ? তাহলে তো জয় রাম স্টোর্সে যে বাচ্চা ছেলেটা বসে পটাপট হিসাব কষে তাকেই অঙ্কের ফাস্ট বয় মানতে হবে ।

আজ অব্দি তিনজন অঙ্কের মাস্টার টুবাইকে বাড়িতে এসে পড়িয়ে গেছেন । সবারই এক মত, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগেই টুবাইয়ের দুর্বলতা । ত্রৈাশিকের সব স্টেপ ঠিক করেও

টুবাই শেষ মুহূর্তে এসে সাতশো বারো কে ষোল দিয়ে ভাগ করতে গিয়ে দশমিকের পরের সংখ্যাটা ভুল করবে। টুবাই নিজেও এর পিছনে কম সময় দেয়নি, কিন্তু কোনভাবেই সংখ্যাগুলো তার কবলে আসতে চায়না। খাতার দিকে তাকালেই মনে হয় সবকটা সংখ্যা মিলে লাফালাফি করছে। কোন নিয়মেই তারা বাঁধা থাকতে চায়না।

আজ মাসের শেষ দিন, অর্থাৎ টুবাই আরেকটা মাকশিট নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সাধারণতঃ এই দিনটায় সকাল থেকেই বাড়ির সবার মেজাজ খারাপ থাকে। আজো তার ব্যতিক্রম হয়নি। ডিনারের সময় টুবাইয়ের অঙ্কের নম্বরটা প্রকাশ্যে এল। বাবা অর্ধেক খেয়েই উঠে চলে গেলেন। টুবাই মাথা নিচু করে কোনওরকমে খাওয়া শেষ করেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এই সময়টায় টুবাই সাধারণতঃ খানিকক্ষণ ফেসবুকে চ্যাট করে। কিন্তু আজ কিছুই ইচ্ছা করছেননা। টুবাই খানিকক্ষণ চুপ করে বিছানায় বসেই রইল। তখনই মনে পড়ল, আজ সকালে একটা বাংলা কবিতা পোস্ট করেছে। কमेंটস চেক করাই হয়নি। টুবাই ফেসবুক খুলল। স্কুলের বন্ধুরা সবাই আজকের পরীক্ষা নিয়ে গল্প করছে। টুবাই বিশেষ উৎসাহ পেলনা। তার কবিতাটাও মাত্র দুটো লাইক পেয়েছে।

ঠিক উইন্ডো বন্ধ করতে যাওয়ার আগেই টুবাই খেয়াল করল, আজ তিনটে নতুন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসেছে। প্রথমজনকে টুবাই চেনেনা, পত্রপাঠ বিদায় করল। দ্বিতীয় মেঘনা সরকার, ক্লাসের প্রথম পাঁচের একজন। অন্যদিন হলে টুবাই সঙ্গেসঙ্গেই অ্যাকসেপ্ট করত, কিন্তু আজ মনটা বিধিয়ে আছে, 'নট নাও' করে দিল। তৃতীয়জনের নাম দেখেই টুবাই থমকে গেল।

স্যার আইজ্যাক নিউটন। প্রোফাইলে একটা পরচুলো পরা মুশকো রাগী টাইপের সাহেব। টুবাই জানে, ফেসবুকে অনেকেই বিখ্যাত লোকেদের নামে নকল প্রোফাইল বানায়। কিন্তু তবুও মনে হচ্ছিল, এই ভদ্রলোকই সেই আদি অকৃত্রিম স্যার আপেল নিউটন।

টুবাই অ্যাকসেপ্ট করল। তারপর মেসেজ করল - “তুমি কি সত্যিই আইজ্যাক নিউটন?”

প্রায় দু মিনিট পরে উত্তর এল - “অবশ্যই! তোমার এত সন্দেহ কেন?”

টুবাই খানিকক্ষণ ভেবে লিখল - “কারণ আমি ভীষণ বোকা আর অন্ধ একদম পারিনা।

আমাকে তুমি কেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে?”

“অঙ্ক আবার পারা না পারার কি আছে ? অঙ্ক কি লংজাম্প নাকি?”

“জানিনা । আমার এত অঙ্ক ভুল হয় যে আমার মনে হয় সংখ্যাগুলো আমার সাথে শয়তানি করছে ।”

“হুঁ, আমারো এরকম হত । সংখ্যাগুলোকে চিনতেই আমার অনেক সময় লেগে গেছিল ।”

“সংখ্যা তো আমি চিনি । এক দুই তিন চার ।”

“না, চেনোনা । তোমার বাবাকে যেভাবে চেনো সেইভাবে চেনো কি? আচ্ছা বলতো, ছয় সংখ্যাটার বৈশিষ্ট্য কি?”

টুবাই ভাবনায় পড়ে গেল । এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এগুলোকে এতদিন খালি সংখ্যাই ভেবে এসেছে । এদের যে নিজেরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, সেটা কখনো মনেই হয়নি ।

“বৈশিষ্ট্য আবার কি ? ছয় হল ছয় । ছয় দুগুণে বারো । ছয় ছয় ছত্রিশ । আর কিছু জানিনা ।”

“আর একটু ভাবো । ছয় এর উৎপাদক, অর্থাৎ factor কি কি?”

টুবাই উৎপাদক মানে জানে, যে সমস্ত সংখ্যা দিয়ে ছয় ভাগ যায় ।

“দুই আর তিন ।”

“আর এক? এক তো সব সংখ্যারই উৎপাদক । এক বাদ দিলে কেন ?”

“আচ্ছা এক, দুই আর তিন । ছয়ের তিনটে উৎপাদক ।”

“এক, দুই আর তিন যোগ করলে কত হয়?”

হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যেই টুবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল ।

“ছয় ।”

“ভেরি গুড । আচ্ছা এই রকম আরেকটা সংখ্যা বলতে পারো?”

টুবাই মনে মনে হিসাব করার চেষ্টা করল । ছয় দুগুণে বারো । বারো-র উৎপাদক হল এক,

দুই, তিন, চার আর ছয় । কিন্তু সেগুলো যোগ করলে বারো হয়না । টুবাই চট করে আঠেরো আর ছত্রিশ দিয়েও চেষ্টা করল । হলনা ।

“কাল বলব । এত হিসাব করতে পারছিনা ।”

“মনে থাকে যেন ।”

সেদিন অনেক রাত অর্ধ টুবাইয়ের ঘুম এলনা । সাত আট নয় দশ থেকে শুরু করে সমস্ত সংখ্যাগুলোকে মনে মনে ভাগ করতে লাগল ।

পরেরদিন স্কুলে গিয়ে টুবাই প্রথমেই অমিতকে প্রশ্ন করল - “শোন, বলতো আঠাশ সংখ্যাটা কেন স্পেশাল ?”

টুবাইয়ের মুখ থেকে অঙ্কের প্রশ্ন শুনে অমিত খানিক অবাক হল । তারপর বলল - “স্পেশাল? কি সেন্সে স্পেশাল । আঠাশ মানে আঠাশ, টোয়েন্টি এইট । আবার কি ?”
টুবাই খাতায় লিখল

$$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$$

“এর মানে?” - অমিতের প্রশ্ন ।

“মানে আঠাশের যতগুলো factor সেগুলো যোগ করলেও আঠাশ, বুঝলি !”

“এতে স্পেশাল কি আছে ?”

টুবাই আর এ নিয়ে কথা বাড়ালনা । কাল রাতে কত চেষ্টায় অবশেষে আঠাশ খুঁজে পাওয়া গেছে, অমিত সেটা বুঝবেনা ।

“ওয়েল ডান । এবার বলো তো তিন, চার আর পাঁচ এর মধ্যে কি সম্পর্ক ?”

এট টুবাইয়ের জানা । “ $3^2 + 4^2 = 5^2$ ”

“বেশি সোজা হয়ে গেল মনে হচ্ছে ? তাহলে বলতো এরকম সংখ্যা আর কটা আছে?”

“আমাকে আবার সারারাত ধরে গুণ করতে হবে । কাল বলব ।”

“তোমায় একটা সোজা উপায় বলে দিচ্ছি । তিন, চার আর পাঁচ যে একটা সমকোণী

ত্রিভুজের তিনটে সাইড, সেটা নিশ্চয়ই জানো ।”

“বুঝেছি । একটা স্কেল নিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকতে আঁকতেই সবকটা বেরিয়ে যাবে । পাঁচ মিনিট ওয়েট করো, বলে দিচ্ছি ।”

“শুধু একে একে বললে হবেনা, গুণ করে ভেরিফাই করে বলবে ।”

টুবাই স্কেল আর খাতা নিয়ে বসল । খানিকক্ষণের মধ্যেই বেশ কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়ে গেল।

$$\begin{aligned}3^2 + 4^2 &= 5^2 \\5^2 + 12^2 &= 13^2 \\6^2 + 8^2 &= 10^2\end{aligned}$$

“হুম । আমি প্রথমবার একচল্লিশ অব্দি বার করেছিলাম । $9^2 + 40^2 = 41^2$ ।”

“প্রথমবার ? কবে?”

“অনেকদিন আগে । আমার তখন ষোল বছর বয়স । পীথাগোরাসের বইটা কিভাবে যেন আমার হাতে এসেছিল ।”

“ষোল বছর ? তারমানে ষোল বছর বয়স অব্দি তুমি অঙ্ক জানতেইনা !”

“না, তখন পড়াশোনার এত চাপ ছিলনা । পীথাগোরাসের বইটাও পেয়েছিলাম একটা দোকান থেকে চুরি করে ।”

“তুমি বই চুরি করতে !”

“না তো কি! তখন বইয়ের অনেক দাম । খুব কম লোকের বাড়িতেই দু চারটে বই খুঁজে পাওয়া যেত । ”

“তোমার কোন বন্ধু ছিল?”

“থাকবেনা কেন? তবে আমি একটু মারকুটে ছিলাম বলে সবাই আমাকে ভয় পেত ।”

“আমিও পাই । সত্যি বলব, তুমি আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড হওয়ার আগে তোমাকে মোটেও পছন্দ করতামনা ।”

“কেন?”

“তোমার জন্যেই তো যত সমস্যা ! অঙ্ক আর ভৌতবিজ্ঞানের অর্ধেক বই তো তুমিই ভরে দিয়েছ ।”

“দুঃখিত । আমার উইল করে যাওয়া উচিত ছিল, আমার গবেষণা যেন স্কুলের সিলেবাসে কখনো না ঢোকে ।”

“কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই । তোমার দ্বিতীয় সূত্রটাই আমি এখনো বুঝিনা ।”

“প্রথমটা বুঝেছ? আমার নিজের তো মনে হয় প্রথমটাই বেশি কঠিন ।”

“এতে আর কঠিন কি ! ধাক্কা না দিলে কোন জিনিসই নড়েনা । ছোটবেলায় আমাক ঘুম থেকে তুলতে মা তোষক উলটে দিত । প্রথম সূত্রটা কোন সূত্রই নয়, জাস্ট কমন সেন্স ।”

“ঠিক । ধাক্কা না দিলে কিছু নড়েনা । কিন্তু কেন? এরকমও তো হতে পারত যে সবকিছু নিজে থেকেই নড়েচড়ে বেড়ায় । সেটা না হয়ে এরকমই কেন হল?”

টুবাই এ ব্যাপারটা কখনো ভেবে দেখেনি । সূত্র হল সূত্র, তার পিছনেও যে একটা 'কেন' থাকতে পারে টুবাইয়ের এটা কখনো মাথায় আসেনি ।

সেদিন অনেক চিন্তা নিয়ে শুতে গেল টুবাই ।

দু সপ্তাহ পরেই টুবাই খেয়াল করল, গুণ ভাগ করতে তার আর ভুল হচ্ছেনা । পরের মাসে অঙ্কে টুবাই জীবনের সেরা নম্বর পেল । যদিও ফার্স্ট হলনা ।

সেদিন রাতে টুবাইয়ের বাবা টুবাইয়ের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে এসে বললেন - “এত রাত অব্দি ফেসবুকে কি করছিস?”

বলতেই তার নজর চলে গেল মনিটরের দিকে । স্ক্রিনে একটা দ্বিঘাত সমীকরণ।

“তোদের তো এখনো স্কুলে অ্যালজেব্রা শুরুই হয়নি । তুই কোয়াদ্রাটিক করছিস যে ?”

টুবাই মনিটর থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল - “আমি পারি ।”

“তোকে এসব কে শেখাল ।”

“অ্যালজেব্রার বই থেকে শিখেছি ।” সে যে নিউটনের বন্ধু, এটা বললে কেউ বিশ্বাস

করবেনা টুবাই এটুকু জানত ।

টুবাইয়ের বাবা আর কিছু না বলে চলে গেলেন ।

ক্লাস সেভেন থেকে টেনে উঠল টুবাই । এর মাঝে সমস্ত অঙ্ক পরীক্ষাতে টুবাই পচানববই প্লাস পেয়ে এসেছে, কয়েকবার একশোও পেয়েছে । কিন্তু সত্যি বলতে স্কুলের অঙ্কে টুবাই আর ইন্টারেস্ট পেতনা । ইতোমধ্যে তার দ্বিঘাত সমীকরণ, লগারিদম, পারমুটেশন, ত্রিকোণমিতি, ঘন জ্যামিতি, গতির সমীকরণ সবই শেখা হয়ে গেছে । টুবাই ক্লাস ইলেভেনের বই থেকে ফিজিক্সের অঙ্কও করতে শুরু করেছে । মেকানিক্স মোটামুটি আয়ত্ত হয়ে গেছে ।

একদিন নিউটনের সাথে চ্যাট করতে করতে হঠাৎ টুবাইয়ের একটা খটকা হল ।

“আচ্ছা, গতিশক্তির সমীকরণ তো $\frac{1}{2} mv^2$?”

“হ্যা, কেন আবার কি পোকা নাড়া দিল?”

“এমন কিছু না । তুমি তো বলো v অর্থাৎ বেগ হল আপেক্ষিক । আমি যদি একটা চলন্ত ট্রেনে বসে পাশের লাইনে আরেকটা ট্রেনকে একইদিকে চলতে দেখি, তবে মনে হয় যেন সেটা ভীষণ আন্তে চলছে ।”

“বেগ আপেক্ষিক তো বটেই । তোমার প্রশ্নটা কি?”

“তাহলে গতিশক্তি অর্থাৎ energy, যেটা বেগের উপর নির্ভর করে, সেটা কি আপেক্ষিক নয়?”

নিউটনের উত্তর আসতে খানিকটা সময় লাগল ।

“আমার এক বন্ধু ঠিক এই প্রশ্নটাতেই আমায় জব্দ করেছিল । তোমার সাথে কাল আলাপ করিয়ে দেব ।”

পরেরদিন বিকেলে ফিজিক্স টিউশন থেকে বেরোতেই টুবাইয়ের ফোনে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এল।

এবার এক বুড়ো সাহেবের ছবি, ঝাঁকড়া সাদা চুল, মোটা গৌঁফ।

নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ।

ফি বো না চি

রবার্ট সিলভারবার্গ

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । এবং সেই দাম বাজারদরের সাথে পাল্লা দিয়ে ওঠানামা করে । এই মুহূর্তে যদি নরহরি মল্লিককে জিজ্ঞাসা করেন – আপনার এক মিনিট সময়ের কত দাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন “বাহাতুর টাকা বারো পয়সা” । হয়তো পাঁচ মিনিট পরেই সেটা নেমে দাঁড়াবে চুয়াল্লিশ টাকা সাতষটি পয়সায় । নরহরি মল্লিক শেয়ার বাজারের ঘাঘু ব্রোকার, অতএব তার সময়ের দামটাও সেনসেবলের সাথে ওঠেবসে করে ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তার এই বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে তিনি একটা সেকেন্ড নষ্ট হতে দেননি । ষোল বছর বয়সে শেয়ার বাজারে প্রথম পদার্পণ করেছেন । বাজারের খুঁটিনাটি শিখে নিতে তিনি চার বছরের বেশি সময় নষ্ট করেননি । একুশ বছর বয়স থেকে স্বাধীন ব্রোকার । তিরিশে নিজের এজেন্সি । আজ বারো বছর পরে তার অধীনে সাইত্রিশজন ব্রোকার, তিনটে ফ্ল্যাট, চারটে গাড়ি - তারমধ্যে একটা জাগুয়ার । ক্যালকাটা ক্লাবে রেগুলার যাতায়াত । এক থেকে একশো বানানোর কায়দা নরহরি দেখিয়ে দিয়েছেন । আজ কলকাতার বেশিরভাগ মাঝারি সারির ব্যবসায়ীর পোর্টফোলিও হ্যান্ডেল করে মল্লিক এন্ড কোং ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই ভালরকম প্রতিষ্ঠালাভের পরও তার অভ্যাসের নড়চড় হয়নি এতটুকু । তার কাছ পাঁচ লাখের যা দাম পাঁচ পয়সারও তাই । তাই শেয়ার বাজারে এখনো তার পরিচিতি 'শাইলক' নামে । নিয়ম করে রোজ সকাল আটটায় তার অফিস খোলে । দিনে বারো ঘন্টা, বছরে তিনশো পয়ষটি দিন, ছুটি নেই কখনও । নরহরি নিজেও এক সেকেন্ড সময় কাজের বাইরে নষ্ট করেননা, কারোকে করতেও দেননা । চেয়ার ছেড়ে সিগারেট খেতে উঠেছিল, এই অপরাধে দুজনের চাকরি যাওয়ার পরে অফিসের বাকি সবাই বুঝে গেছে, নরহরি কি ধাতুর তৈরি । বাবার মৃত্যু, বোনের বিয়ে, মায়ের অসুখ, এই সমস্ত ছুতোনাতায় অফিসের সময় বরবাদ, অর্থাৎ কিছু পয়সা হাত গলে

বেরিয়ে যাওয়া, নরহরি সহ্য করতে পারেননা মোটেও । তার স্পষ্ট নির্দেশ, ছুটির দরখাস্তের সাথে রেসিগনেশনটাও টেবিলে রেখে যাও । লোকসান তার ধাতে সয়না, কোন ব্রোকারের ক্লায়েন্ট ফসকে গেলে তিনি সারা অফিসকে শুনিয়ে তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করেন । ফাঁকিবাজির মাশুল এক পয়সাও তিনি দিতে রাজি নন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই তিনি জানেন যে বড় বড় বিজনেস পাকড়াও করতে গেলে তাকে এখন থেকেই উঠেপড়ে লাগতে হবে । সারাদিন তিনি অবিশ্রান্ত ফোনে লেগে থাকেন, সন্কেবেলায় কাটে এ ক্লাব থেকে ও ক্লাবে, যদি কিছু মোটা ক্লায়েন্ট ধরা যায় । বড় কোম্পানির ম্যানেজারদের বশ করার সমস্ত ছলাকলায় তিনি এতদিনে পারঙ্গম হয়ে উঠেছেন । এর জন্য সমস্তরকম অনৈতিক কাজেও তিনি পিছপা নন । কিন্তু এত করেও নরহরির মনে হয়, তার এজেন্সি এক জায়গায় এসে ঠেকে যাচ্ছে । এর পরের লেভেলটা কিছুতেই তার নাগালের মধ্যে আসছেননা । তার ইচ্ছা আরো তাড়াতাড়ি সবকিছু তার হাতের মধ্যে এসে যাক । সময় তার ওপর দ্রুত বয়ে যাক । সেই দিনটা তিনি জলদি দেখতে চান, যেদিন তিনিই কলকাতার শেয়ার বাজারের রাজা হবেন । সেই দিনটা আসা না অন্দি এক একটা ঘন্টা যেন তার অসহ্য মনে হয় ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই আজ দুপুরে একটা ডিল ফাইনাল হওয়ার পরেই নরহরি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন । বেশিদূর না, তার হাতঘড়িটা অনেক দিন ধরেই গোলমাল করছে । গ্রে স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকেই নতুন একটা কিনে নেবেন । এখন প্রচুর চাইনিজ ঘড়ি সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে । খানিকক্ষণ বাছাবাছি করার পর একটা ফ্যাকাশে সবুজ রঙের ডিজিটাল ঘড়ি পছন্দ হল । দোকানদারের দিকে চেয়ে নরহরি খানিকক্ষণ বোঝার চেষ্টা করলেন । কিন্তু তার শামুকের খোলের মত টুপি আর দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে কিছুই বোঝা গেলনা । বেশ কিছুক্ষণ দরাদরি করে অবশেষে সাড়ে তিনশো টাকায় রফা হল । ঘড়িটা হাতে নেওয়ার সময় শামুকের খোলের মত টুপির নিচে বোধহয় একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই নতুন হাতঘড়িটাকে তিনি অফিসের ঘড়ির সাথে ঠিক দুপুর একটার সময় কাঁটায় কাঁটায় মেলালেন । তারপর আবার একটা নতুন ক্লায়েন্টের

কাজে ডুবে গেলেন । আজ সন্কে সাতটার সময় এই কোম্পানির ফাইনানশিয়াল ম্যানেজারের সাথে বোট ক্লাবে ডিনার । কাগজপত্র তো তৈরি রাখতেই হবে, তার সাথে নতুন ক্লায়েন্টের জন্য উপদটোকনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে । রঘু নামে ছেলেটা এই নতুন ক্লায়েন্টের কেসটা দেখছে । নরহরি রঘুকে ডেকে পাঠালেন । ডিনার টেবিল, হোটেল রুম, গিফট, নেগোশিয়েশনের টার্মস এই সমস্ত রঘুর সাথে ফাইনাল করতে করতেই প্রচুর সময় কেটে গেল । রঘু যখন ফাইনালি ঘর থেকে বেরল, নরহরি তার হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন – দুটো বাজে।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই লাঞ্ছের জন্য তিনি বিশেষ সময় নষ্ট করেননা । আজো তিনি রোজকার মত তার ব্রিফকেস খুলে ছোট প্লাস্টিকের টিফিনবক্স বার করলেন । বছর তিনেক হল তাকে সুগার ধরেছে । একটা শশা, কিছু সেদ্ধ ছোলা আর একটা সুগার ফ্রি বিস্কুট, এই সংক্ষিপ্ত লাঞ্চ শেষ করে তিনি ফের কাগজপত্র খুলে বসলেন । আর তখনই হাতঘড়িটার দিকে তার নজর পড়ল । দুপুর তিনটে ।

নরহরি মল্লিকের সময়ে দাম আছে । তাই তার মাথাটা হঠাৎ একবার বাঁ করে ঘুরে গেল । এক গ্লাস জল খেয়ে তিনি অফিসের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন । যথার্থই তিনটে বাজে । নরহরি নিজের চেম্বার ছেড়ে অফিসের হলঘরে এসে বড় দেওয়াল ঘড়ি দেখলেন । তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এসে দূরের আরমেনিয়ান চার্চের ঘড়িটাও মেলালেন । তিনটে যে বাজে তাতে কোন সন্দেহই নেই । অর্থাৎ নরহরি মল্লিক গত একঘন্টা ধরে লাঞ্চ করেছেন । খানিকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় নরহরি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন । তারপর ধীরে ধীরে নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই পুরো ব্যাপারটাকে মনের ভুল মনে করে তিনি আবার কাজে মন দিলেন । একটা ছোট ওষুধ কোম্পানির তিনি সাতাত্তর পার্সেন্ট শেয়ারহোল্ডার । বেশ কিছুদিন সেটা ভাল ব্যবসা দিচ্ছেনা । দাম আরো পড়ে যাওয়ার আগে নরহরি শেয়ারগুলো বেচে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন । কিন্তু গতকালই কোম্পানির ম্যানেজার পায়ে ধরে রিকোয়েস্ট করে গেছে আরো কিছুদিন দেখতে । কোম্পানিতে বাকি পয়সা সে নিজ ঢেলেছে, এখন নরহরি উইথড্র করে নিলে সে পরিবার

নিয়ে পথে বসবে । মরুকগে । অনেকদিন দেখছেন নরহরি । আর নয় । তিনি দাতব্য করতে তো বসেননি । নরহরি কম্পিউটারে একটা ক্লিক করে তার শেয়ার বেচে দিলেন । যা হবার হবে । আরাম করে খানিকক্ষণ চেয়ার হেলান দিয়ে বসলেন নরহরি । আর তখনই ঘড়িটার দিকে তার নজর পড়ল । বিকেল পাঁচটা ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ি দেখা তার অভ্যাস । তাই তিনি হলফ করে বলতে পারেন, ওই ঘড়িতে কখনো চারটে বাজেইনি । খানিকক্ষণের জন্য নরহরি উদভ্রান্ত হয়ে উঠলেন । তারপর রঘুকে ডেকে সময় জিজ্ঞাসা করলেন । বিকাশকে ডাকলেন । অনিমাকে ডাকলেন । শেষমেষ গুরুদীপও যখন বলল যে এখন বিকেল পাঁচটাই বাজে, তখন নরহরি আবার নিজের কাজের জগতে ফিরে এলেন । ক্লায়েন্টের সাথে ডিনারের আর মাত্র দু ঘন্টা বাকি । রঘুকে পাঠাতে হবে অন্ততঃ এক ঘন্টা আগে । তিনি নিজে পৌঁছবেন ছটা পঞ্চাশে । কলকাতার ট্রাফিকের ওপর নরহরির কখনোই ভরসা নেই । ফোন করে ছটার সময় গাড়ি বলে রাখলেন । আর এক ঘন্টার মধ্যে এই ক্লায়েন্টের কাগজপত্র গুছিয়ে ফেলতে হবে । যথেষ্ট সময় । নরহরি একটা সিগারেট ধরালেন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই তিনি যথেষ্ট সময় নিয়েই অফিস থেকে বেরলেন । পার্ক সার্কাস ফ্লাইওভার ক্রস করার সময় তিনি ঘড়ি দেখলেন, ঘড়িটা এখনো বিকেল পাঁচটাতেই আটকে রয়েছে । নাঃ, শামুকখোলের মত টুপি নিতান্তই ঠকিয়েছে । কালকেই ফেরৎ দিতে হবে । কিন্তু নরহরি ড্রাইভারকে সময় জিজ্ঞাসা করতে সেও যখন বলল বিকেল পাঁচটা, তখন নরহরি বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়লেন । তার কি মাথা খারাপই হয়ে গেল ? নাকি দুনিয়ার সব ঘড়িই একসাথে অচল হয়ে পড়ল ? যাকগে, ডিনারের এখনো ঢের সময় বাকি । আর পাঁচ মিনিট পরেই বোট ক্লাব ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই বোট ক্লাবে গাড়ি থেকে নামতেই যখন তিনি ঘড়ি দেখলেন, তখন এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় বন্ধ হয়ে গেল । রাত আটটা । ছুটতে ছুটতে তিনি টেবিলের কাছে পৌঁছলেন । রঘু একাই টেবিলে বসে । জানা গেল, আধ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর বিরক্ত ক্লায়েন্ট বিদায় নিয়েছেন, এবং এই জাতীয় নন প্রফেশনাল লোকের সাথে ডিল করতে তারা যে আগ্রহী নন সেটাও ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই আর সময় নষ্ট না বোট ক্লাবের টেবিলে বসেই তিনি তার সমস্যাটাকে বোঝার চেষ্টা করলেন । হাতঘড়িটা কেনার পর থেকেই তার সময়ের হিসাবটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন । একটার সময় ঘড়িটা সেট করা, তারপর দুটো, তিনটে, পাঁচটা, এবং আটটা । নরহরির অঙ্কের মাথা ছোট থেকেই ভাল । সংখ্যাগুলোর দিকে চেয়ে তিনি একটা সম্পর্ক ধরতে পারলেন ।

$$1 + 1 = 2$$

$$2 + 1 = 3$$

$$3 + 2 = 5$$

$$5 + 3 = 8$$

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । এর পর কটায় গিয়ে ঘড়ি থামবে সেটা ভাবতেই তার ঘাম দিয়ে উঠল । নরহরি আর ভাবতে পারলেননা । এই কালান্তক ঘড়ি তার জীবন থেকে সময় চুরি করে নিচ্ছে নরহরি ঘড়িটা হাত থেকে খুলে ফেলতে মরীয়া হয়ে উঠলেন । কিন্তু খুলতে গিয়েই আবিষ্কার করলেন, ঘড়ির স্ট্র্যাপের সাথে লাগানো ছকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে । অর্থাৎ ঘড়িটা একটা হাতকড়ার মত তার হাতে চেপে বসেছে । নানা কসরৎ করেও ঘড়িটাকে হাত থেকে বার করা গেলনা । নরহরি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । একথা তার পরিবারের সবাই জানে । বাজে কাজে সময় নষ্ট করার লোক যে তিনি নন, একথাও সবার জানা । তাই দরজা খুলেই তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন - “এত রাত করলে যে? রাত একটা বাজে খেয়াল আছে?” নরহরি কোন উত্তর না দিয়েই সোজা বিছানায় শয্যাশায়ী হলেন । পরদিন সকাল নটায় ঘুম ভাঙতেই নরহরি সোজা গাড়ি নিয়ে গ্রে স্ট্রিটের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই শামুকখোলের মত টুপি আর দাড়িগোঁফের জঙ্গল অদৃশ্য । তার জায়গায় একগাদা প্লাস্টিকের খেলনা নিয়ে বসেছে এক ছোকরা । নরহরি অনেক সন্ধান করেও সেই দোকানদারের সন্ধান পেলেননা । শুধু তাই নয়, ফুটপাথের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল, এমন কাউকে তারা কখনওই দেখেনি ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই তিনি চটপট হিসাব কষে নিলেন । এই ঘড়ির আর উনিশ ঘন্টার মধ্যে তার বয়স এক বছর বেড়ে যাবে । তারপর আরো দ্রুত, আরো দ্রুত হারে এই ঘড়ি চলতে থাকবে । এর মধ্যেই তাকে জীবনের বাকি কাজ শেষ করে ফেলতে হবে । একেবারেই সময় নেই । নরহরি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গাড়ি অফিসের দিকে ফেরালেন । এর পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটতে থাকল । সকাল দশটায় নরহরি অফিসে ঢুকলেন । দুপুর বারোটায় তার মুখে বয়সের ছাপ এল, একটার সময় তার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে এল, দুপুর দুটোর সময় তাকে একইসাথে ছানি আর আত্মহীনতায় ধরল ।

নরহরি মল্লিকের সময়ের দাম আছে । তাই দুপুর তিনটোর সময় যখন তার মৃতদেহ নিজের চেম্বারেই আবিষ্কৃত হল, তখনো তার হাতে ঘড়িটা পরাই ছিল । বিয়াল্লিশ বছরের নরহরি যখন মারা গেলেন, তখন তার বয়স হয়েছিল আটাত্তর । এবং তার হাতঘড়িতে সময় দেখিয়েছিল 317811, অর্থাৎ আঠাশ নম্বর ফিবোনাচি সংখ্যা ।

ধর্মক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত

জেলের প্রাচীর পার করিয়া বাহিরে আসিয়া শঙ্কর এক মুহূর্তের জন্য জিরাইয়া লহিল । হাইড্রেনের শিকল কাটিতে বেশ খাটনি হইয়াছে । শঙ্করের সারা শরীরে ময়লা, কপাল ভাল বংশীবাবু একটা প্যান্ট শাটের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন । না হইলে কয়েদীর কাপড় পরিয়াই পালাইতে হইত ।

সামনে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর । তাহা পার করিলেই রেললাইন । একবার পৌঁছাইতে পারিলেই নিশ্চিত । ট্রেনের আসাযাওয়া লাগিয়াই থাকে । শঙ্কর মনে মনে হিসাব করিয়া লহিল । জেলে এখনো কেউ তাহার অন্তর্ধানের খবর পায় নাই । পা চালাইয়া চলিলে পনের থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে সে এই প্রান্তর পার হইয়া যাইবে । তাহার পর যে কোন একটা ট্রেনে উঠিয়া সকালে বংশীবাবুর ডেরায় । বাস, সকলের ধরাছোঁয়ার বাহিরে।

চারিপাশে একবার ভাল করিয়া নজর বুলাইইয়া লইল শঙ্কর । নাঃ, কাহাকেও দেখা যাইতেছেনা । অর্থাৎ প্রহরীকে ভালই বশ করিয়াছিল শঙ্কর । অবশ্য নজরানাও কম দিতে হয় নাই। বংশীবাবু ভালই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু এই মুহূর্তে জেলের বাহিরে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া শঙ্করের যে অনুভূতি হইতেছে, তাহার জন্য কোন মূল্যই যথেষ্ট নহে । এখন তাহার মুক্তির পথে বাধা রহিয়া গিয়াছে শুধু এই প্রান্তর । শঙ্কর একবার হাত পা গুলাকে ছড়াইয়া টান টান করিয়া নিল । আর তখনই কুকুরটা তাহার নজরে পড়িল ।

একটা ঘিয়ে রঙের নিতান্ত দেশি সারমেয় । পিঠের উপর সাদা সাদা লোমের ছোপ ছোপ । পিছনের বাঁ পা কিছু সংক্ষিপ্ত, বোধহয় খঞ্জ । শঙ্করের পাঁচ কি ছয় ফুট সামনে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে ।

কুকুরটাকে কি শঙ্কর আগে দেখিয়াছে ? নাঃ, শঙ্কর চিন্তাটাকে মাথা হতে বাহির করিয়া হাঁটা শুরু করিল । কুকুরটা গ্রাহ্য করিবার মত কিছুই নহে । ওই জাতীয় কুকুর এই প্রান্তরের মধ্যেই আরো দু চারিটা পাওয়া যাইলেও অবাক হইবার কিছু নাই।

মার্চ মাসের শেষ, রাতের বাতাসে এখনো খানিক ঠান্ডার টান রহিয়া গিয়াছে । দু হাত

পকেটে রাখিয়া শঙ্কর চলিতে লাগিল । কুকুরটা শঙ্করের সামনে সামনে চলিতেছে । শঙ্কর পা চালাইয়া চলিতে লাগিল । বংশীবাবুর সবদিকে নজর রহিয়াছে মানিতেই হইবে, প্যান্টের পকেটে দুটো বিড়ি আর একটা দেশলাই বাস্তবিক সন্ধান পাইল শঙ্কর । অন্ধকারের মধ্যে দেশলাইটা ধরাইতেই একটা দৃশ্য শঙ্করের চোখে ভাসিয়া উঠিল ।

বস্তির ভিতর একটা চালাঘর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে । ভিতর থেকে ভাসিয়া আসিতেছে পরিব্রাহি কান্নার আওয়াজ । শঙ্করের প্রথম বড় 'অ্যাসাইনমেন্ট' । বংশীবাবুর পুরনো খরিদার । কোন এক 'ডিল' পন্ড হইয়া যাইতে বংশীবাবুর চক্ষুশূল হইয়া ওঠে । নিজে দাঁড়াইয়া শঙ্কর কাজটা শেষ করিয়াছিল । শেষ বলিতে শেষ । একটা বাচ্চা মেয়ে কোনওভাবে পিছনের দরজা দিয়া বেরিয়ে আসিতে পারিয়াছিল । শঙ্কর নিজের হাতেই তাকে জ্বলন্ত চালার ওপর ছুঁড়িয়া দেয় । কাজে বাকি রাখিতে নাই ।

দৃশ্যটা বিড়ির ধোঁয়ায় মুছিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল শঙ্কর । এখন তাহার সামনে শুধু এই প্রান্তর, আর কিছু নহে । কুকুরটা সমানে তাহার আগে আগে চলিতেছে । বন্ধুর জমির উপর তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া শঙ্কর মাঝে মাঝেই হৌচট খাইতেছিল । হঠাৎ একটা গর্তে পা পড়িতে শঙ্কর পড়িয়াই গেল । ডান হাতে ভর দিয়া যেই উঠিতে যাইবে অমনি আরেকটা দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল ।

ঠিক এইভাবেই মাটিতে পড়িয়া ছিল দীনেশ । বডি আবিষ্কার হইবার পূর্বে অন্ততঃ তিন দিন । দীনেশ শঙ্করের স্কুলের বন্ধু । বলিতে গেলে দুজনে ছিল হরিহরাত্মা । ক্লাস সিক্সে যখন শঙ্করের স্কুলের পর্ব ইতি হইল, দীনেশ অনেক করে বুঝাইয়াছিল । কিন্তু কোন ফল হয় নাই । তাহার পর দীনেশ গ্র্যাজুয়েট হইল, আইন পাশ করিল, এবং তাহাকে কমিউনিজমে পাহিয়া বসিল । মফস্বলে ফিরিয়া আসিয়া সোশাল ওয়ার্ক শুরু করিল, প্রোমোটর রাজ আর তোলাবাজির বিরুদ্ধে মাথা তুলিল । ফলতঃ যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল, বংশীবাবুর সাথে শত্রুতা । এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, মাথায় শঙ্করের রডের বাড়ি ।

কিন্তু আজ দীনেশের রক্তদ্বিত মুখ কেন মনে আসিল শঙ্করের ? এই প্রান্তর কি কিছু বেশিই বড় মনে হইতেছে না ? শঙ্কর ধুলো ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াল । আর তো বেশিদূর নহে । দূরে রেললাইনের ক্ষীণ আলো দেখা যাইতেছে । শঙ্কর একবার দূরত্বটা মাপিয়া লইয়ার চেষ্টা

করিল । অন্ততঃ আধা কিলোমিটার তো শঙ্কর হাঁটিয়াই পার করিয়াছে । তবু রেললাইন কিছুমাত্র নিকট মনে হইতেছেনা কেন?

কুকুরটা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে । পিছন ফিরিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া আছে, যেন তাহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে ।

আর তখনই বিদ্যুচ্চমকের মত শঙ্করের মনে পড়িল ।

এই কুকুর শঙ্করের চেনা ।

জেলে যাইবার পনের দিন আগেকার কথা । শঙ্কর আর আসগর গিয়াছিল এক ক্লায়েন্টের নিকট টাকা 'রিকভার' করিতে । গঙ্গাতীরের এক শ্মশানে মোলাকাত । বিনা পরিশ্রমেই টাকা উদ্ধার হইল । টাকার বান্ডিল লইয়া বাহির হইবার মুখেই শঙ্করের মাথায় বুদ্ধিটা খেলিয়া গেল ।

এই টাকা যে আদৌ উদ্ধার হইয়াছে তাহা জানে শুধু শঙ্কর আর আসগর ।

এই সমীকরণ থেকে আসগরকে মুছিয়া দিলে পুরো অঙ্কটাই শঙ্করের । বংশীবাবু জানতেও পারিবেন না । কারণ আসগর বা ক্লায়েন্ট, কাহারো লাশ কোন কথা বলিবেনা ।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ । শ্মশানের একপাল কুকুরের সন্মিলিত কলরবের মাঝে আসগরের আত্ননাদ চাপা পড়িয়া গেল ।

এই কুকুরটা কি সেদিনও এমনভাবে শঙ্করের দিকে চাহিয়া ছিল ?

শঙ্কর এবার মরীয়া হয়ে ছুটিতে শুরু করল । কিন্তু আশ্চর্য, শঙ্কর প্রাণপণে ছুটেও রেললাইনের কিছুমাত্র নিকটে আসিতে পারিলনা । শঙ্কর যতই অগ্রসর হয়, রেললাইনের আলোগুলিও যেন ততই পশ্চাদপসরণ করে ।

দুইয়ের মাঝে যেন এক অলঙ্ঘ্য ব্যাবধান ।

শঙ্কর নিজের চারিপাশে চাহিয়া দেখিল । যেদিকে চোখ যায়, খালি বিস্তীর্ণ প্রান্তর । আকাশ নিশ্চল, কালো । মাটি রুক্ষ, বন্ধুর । পৃথিবীর সব আলো নিভিয়া যেন শুধু রেললাইনটাই জাগিয়া আছে ।

আর জাগে ওই কুকুর, যে শঙ্করকে কোন অদৃশ্য মরীচিকার পথে ছুটাইতেছে ।

শঙ্কর বুঝিতে পারিতেছিল, তাহার দম শেষ হইয়া আসিতেছে ।

সে কোনদিনই ওই রেললাইনে পৌঁছতে পারবেনা ।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল । ঠিক তখনই মেঘ ছিড়িয়া আকাশে থালার মত চাঁদ উঠিল ।

যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গদ্বারে ছাড়িয়া আসিয়া পরেরদিন সকালে ফেরার পথে ধর্মরাজ আবিষ্কার করিলেন, জেলের প্রাচীরে হেলান দিয়া শঙ্করের মরিয়া কাঠ হওয়া শরীরটা বিস্ফারিত নেত্রে সামনে চাহিয়া আছে ।

জেলার সাহেব অবশ্য কিনারা করিতে পারিলেন না, কেন প্রাচীর পার করিয়াও শঙ্কর আর এক পাও এগোয় নাই ।

আ কি লি স

বনফুল

কচ্ছপ আকিলিসের নিকট আসিয়া কহিল - “হে আর্ঘশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমি সর্বজনসমুখে দৌড় প্রতিযোগিতায় আহ্বান করি !”

আকিলিস কহিলেন - “ফুঃ ।”

কচ্ছপ কহিল - “এবং ইহাও আপনাকে অবগত করিতে চাই যে আপনার পরাজয় নিশ্চিত জানিবেন !”

আকিলিস কহিলেন - “হে কূর্মাধিপ ! আপনার প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও প্রশ্ন করিতে চাই, আপনার এই স্থিরনিশ্চয়ের কারণ কি ? বিশেষতঃ যখন প্রতিপক্ষ গ্রীস সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর ।”

কচ্ছপ কহিল - “কারণ আমার একটি শর্ত রয়েছে । আমি আপনার এক হস্ত মাপ আগে থেকে শুরু করিব ।”

আকিলিস কহিলেন - “মহাশয়, আপনি যদি মনে করেন যে মাত্র এক হস্ত আগে হইতে আরম্ভ করিয়া আপনি দৌড়ে আকিলিসকে পরাস্ত করিবেন, সেক্ষেত্রে আমার বলিবার কথা একটিই । যে ঈশ্বর আপনাকে এইরূপ বুদ্ধি দান করিয়াছেন, তাহার রাজত্বে এমন ঘটনা সম্ভবপর বটে !”

কচ্ছপ কহিল - “হে বীরবর, আপনি যদি শৈশবে ক্রীড়নক ও কন্দুকে মত্ত না হইয়া কিছু সময় গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তবে জানিতেন, 'জেনোর প্যারাডক্স' অর্থাৎ 'জেনো কূট' অনুসারে আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভবী ।”

আকিলিস কহিলেন - “তাহা কি প্রকার কূট জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করি !”

কচ্ছপ কহিলেন - “হে অমিতবেগ ! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন । আমি ও আপনি একই সাথে দৌড় শুরু করিব । শুধু শর্তানুসারে আমি আপনার এক হস্ত আগে আরম্ভ করিব ।”

আকিলিস কহিলেন - “হুঁ ।”

কচ্ছপ কহিল - “এবার মনে করুন এই এক হস্ত দূরত্ব আপনি এক সেকেন্ডেই অতিক্রম করিলেন।”

আকিলিস কহিলেন - “বটে।”

কচ্ছপ কহিল-“পুনশ্চ মনে করুন এই এক সেকেন্ডে আমি সিকি হস্ত মাত্র অগ্রসর হইয়াছি !”

আকিলিস কহিলেন - “ঠিক।”

কচ্ছপ কহিল - “এবং এই সিকি হস্ত দূরত্বও আপনি সিকি সেকেন্ডেই অতিক্রান্ত হলেন।”

আকিলিস কহিলেন - “অবশ্য।”

কচ্ছপ কহিল - “কিন্তু হে মহাপরাক্রম ! সেই সিকি সেকেন্ডে আমি আরও কিছু দূরত্ব, মনে করুন ১/১৬ হস্ত অতিক্রম করিয়াছি। যাহা অতিক্রম করিতে আপনার সামান্য, অতি সামান্য হলেও সময়ের প্রয়োজন।”

আকিলিস দ্রুত কুণ্ঠিত করিলেন।

কচ্ছপ কহিল - “এবং এইরূপে দেখানো যাইল যে আপনি যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তেই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না।”

আকিলিস তাহার সুবর্ণরত্নমণ্ডিত তরবারি কোষনিষ্কাশিত করিয়া কহিলেন - “হে কূর্মকুলদীপ ! এই জেনো নাম্নী ভদ্রমহোদয়ের বাসস্থান জানিতে বাসনা করি।”

কচ্ছপ কহিল - “হে বিচিত্রবীর্য ! আসুন এই ক্ষণেই আমরা দুইজন এই রাজপথে অবতীর্ণ হইয়া এই কূটের মীমাংসা করিয়া ফেলি।”

আকিলিস ও কচ্ছপ দৌড় শুরু করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই কচ্ছপ লক্ষ্য করিলেন, আকিলিস তাহার অগ্র পশ্চাৎ কোথাও নাই। কচ্ছপ পশ্চাদবর্তী হইয়া আকিলিসের খোঁজে চলিলেন।

একটি প্রেক্ষাগৃহের প্রাচীরে চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবীর বিশাল পোস্টার পড়িয়াছে।

আকিলিস মনোযোগ সহকারে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন।

জেনো কূট অমীমাংসিত রহিয়া গেল।

হারমোনিয়াম

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাতসকালে জটেশ্বর হারমোনিয়াম নিয়ে সা-তে সুরটা লাগাব লাগাব করছে, এমন সময় ব্যাঘাত । এমনিতেই সা লাগাতে জটেশ্বরের আধা-পৌনে ঘন্টা কেটে যায় । এ ব্যাপারে জটেশ্বরের গুরু ছিলেন খুব একরোখা । জটেশ্বরকে বলতেন - “শোন জটেশ্বর, সকাল সকাল উঠে মন দিয়ে সা তে সুর লাগাবি । যত সময় লাগে লাগুক, সা যেন ফস্কে না যায়, তাহলেই বিপদ । সা না লাগলে বুঝবি তোর গুরুর কবরের ভিতরেও সর্বাস্থে শুয়োপোঁকা লেগেছে, ভীষণ চুলকানি হচ্ছে । গুরুবাক্য ফেলবিনে, সা তে সুর না লাগলেই মহাপাতক !”

তাই পিছন থেকে গলাখাঁকারির শব্দ শুনে জটেশ্বর বেশ বিরক্তই হল । পিছন ফিরে দেখল, একটা বেঁটেমত গোলগাল লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে । জটেশ্বর লোকটাকে চিনতে পারলনা । এই অঞ্চলের লোক নয় নিশ্চয়ই, কারণ জটেশ্বরের রেওয়াজ এত কাছ থেকে শোনার সাহস কারোরই হবেনা ।

“আহা তোফা গাইছেন কত্তা, থামেন কেন, চালিয়ে যান, চালিয়ে যান ।”

জটেশ্বরের বিরক্তির ভাবটা কমে গিয়ে মনে একটু খুশি খুশি ভাব এল । এতখানি প্রশংসা সে কখনো কারোর মুখেই শোনেনি । কিন্তু মুখের রাগী ভাবটা বজায় রেখেই বজায় প্রশ্ন করল - “তা আপনি কে? কোন গাঁ থেকে ঠেঙ্গিয়ে রেওয়াজ শুনতে এসেছেন?”

লোকটা মুখ গদগদ করে বললে - “আমরা ছোটখাট লোক, আমাদের নাম ধাম না ই বা জানলেন কত্তা । তবে কি জানেন, আমরা গুণীর কদর দিতে জানি । এই পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেম, তখনই কত্তার রেওয়াজ কানে এল, আহা ! কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল । এ গাঁয়ে যে এতবড় ওস্তাদের ঘর, তা জানলে কি আমরা আর এতদিন চুপ করে বসে থাকতাম !”

জটেশ্বরের মনটা ক্রমেই খুশিতে ফুলে ফুলে উঠছে । আহা, আরো বলুক, আরো বলুক

লোকটা । জটেশ্বরের গুরু বলতেন লেগে থাক, লেগে থাক ছোঁড়া, এভাবেই একদিন তোর হবে । সাত গাঁয়ের লোক তোর গানের ধন্য ধন্য করবে । তখন থেকে জটেশ্বর নিয়ম করে সাত ঘন্টা রেওয়াজে বসে । সেই রেওয়াজের ধাক্কায় জটেশ্বরের পাশের বাড়ির বিড়ালটা বিধবা হল, হরনাথ ডাক্তার পাড়া ছাড়লেন, এমনকি দুটো একটা হুমকি চিঠিও পেয়েছে জটেশ্বর । তবু গুরুর আদেশ পালন করতে ছাড়েনি জটেশ্বর । আজ তাহলে অবশেষে গুরুবাক্য ফলেছে । জটেশ্বরের মনে খুশির লয়কারী শুরু হয়ে গেল, বুকের ভিতর যেন খুশির একটা পুরো ব্যাটেলিয়ন ডন বৈঠক করত লাগল । জটেশ্বর হাঁক পাড়ল - “ওরে লব ! কোথায় লুকিয়ে আছিস ব্যাটা ! কামাখ্যার দোকান থেকে ঝুড়ি ভরে কচুরি আর জিলিপি নিয়ে আয় ! আজ বড় আনন্দের দিন ! গুরু বলতেন, জটা, একদিন তোর সমঝদার ঠিক মিলে যাবে । দেখ লব ! আরে মশাই আপনি কেন দাঁড়িয়ে, বসেন বসেন !” - জটেশ্বর মোড়াটা এগিয়ে দিল ।

বেঁটে লোকটা মোড়ায় আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলল - “অধমের জন্য কিন্তু কিছু বেশিই করলেন কত্তা ।”

“আহা ও কিছু নয় । একটা সমঝদার এতদিনে পাওয়া গেল, একটু খাতিরযত্ন না করলে গুরুর শাপ লাগবে । তা মশাই ভাল করে এক গেলাস বেলের শরবৎ নিয়ে বসেন না ! মন দিয়ে রেওয়াজ শোনেন, যতক্ষণ খুশি শোনেন । অ্যাই লব !”

“আহা কত্তা, থাক থাক, বেচারাকে আর ব্যস্ত করবেননা । অধম ছোটখাট মানুষ, এত যত্নআত্তি পেটে সইবেনা । বরং কত্তা গানটাই আবার ভালকরে ধরেন । আহা, এমন দরাজ গলা কত্তার, সুরগুলো যেন হাড়ুডু খেলছে !”

জটেশ্বর এবার তত্ত্বপোষের ওপর বাবু হয়ে বসে একবার গুরুপ্রণাম করে নিল । তারপর বেঁটে লোকটার দিকে চেয়ে বলল - “একখানা সকালের রাগ দিয়ে শুরু করি, কি বলেন !”

“আমরা মুখ্যসুখ্য মানুষ গানবাজনার কি বুঝি, কত্তার যা মর্জি শোনায়ে দেন ।”

জটেশ্বর হারমোনিয়ামটাকে কয়েকবার জোরসে বেলো করে একখানা খাম্বাজ রাগিণী ধরল । বেঁটে লোকটা চোখ বুজে দুলে দুলে শুনতে লাগল, আর মাঝে মাঝেই 'কেয়াবাত !

তোফা ! আহা!” চেষ্টাতে থাকল । জটেশ্বরও মনপ্রাণ ঢেলে গাইতে থাকল, দু চারটে গিটকিরিও মেরে দিল । কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আবার ব্যাঘাত ।

“ইয়ে বলি কি ... অপরাধ নেবেন না কত্তা । অধমের ছোট মুখে বড় কথা । হারমোনিয়ামটা কিন্তু কত্তার যোগ্য স্যাস্পাত নয় । কত্তার এমন ভরাট গলা । তার সাথে এমন ফ্যাসফ্যাসে হারমোনিয়াম কি মানায় !”

কথাটা ঠিক । আদ্যিকালের হারমোনিয়াম, উপরের দিকের কয়েকটা রিড ভাস্পা, ভিতরের কলকজাও তালগোল পাকিয়ে বসে আছে । আওয়াজটাও বেশ ক্যানক্যানে, প্রথমবার শুনলে কানে লাগে বটে । তবু জটেশ্বরের গুরুদত্ত হারমোনিয়াম বলে কথা । রোজ সন্ধ্যায় ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করে ।

“বলি কি কত্তা, নবাবগঞ্জের বাজার থেকে এবার একটা ভালমত রেওয়াজি হারমোনিয়াম গড়ে নেন । ওস্তাদের যোগ্য সঙ্গত । অধমের চেনাজানা কারিগর আছে, সস্তায় গড়ে দেবে, কথা বলব নাকি কত্তা ?”

জটেশ্বরের কেমন যেন সন্দেহ হল । “মশাই আমার হারমোনিয়াম নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন তো ?”

“ওই দেখুন কত্তা, খামখা রাগ করছেন । গুণী মানুষের চাই উচিত সঙ্গত । অপরাধ নেবেন না কত্তা, পুলিশের যেমন লাঠি, ডাক্তারের যেমন টেথোস্কোপ, ডাকাতের যেমন সড়কি, গায়কের তেমনি হারমোনিয়াম । যন্ত্রের এমন হবে যে মালিকের ভাবনা সমঝে চলবে । আর যদি অভয় দেন তো আরেকটা কথাও বলি । অধমের একটি পাঁচ বছরের খুকি আছে । খুকির মায়ের সাধ খুব গান শেখানোর । আমরা ছোটখাট মানুষ কত্তা, একখানা আস্ত হারমোনিয়াম ঘরে আনা কি আমাদের সাধ্য ! তাই বলছিলাম কি, কত্তা যদি নতুন একখানা গড়িয়ে নেন তবে এখানা গরীবের ঘরে জায়গা পায় । ওস্তাদের ছোঁয়া জিনিস, কিছুতে বিফলে যাবেনা ।”

জটেশ্বর এবার রেগে উঠল - “খবদার আমার হারমোনিয়ামের দিকে নজর দেবেননা । আপনার খুকির নতুন হারমোনিয়াম আমি গড়িয়ে দেব । কিন্তু আমার গুরুদত্ত

হারমোনিয়ামের কথা মুখে আনলেই সবকটা দাঁত একসাথে ফেলে দেব । আপনার মতলব তো ভাল নয় মশাই । সকাল সকাল আমার হারমোনিয়াম হাতিয়ে নিতে এসেছেন ! অ্যাই লব !”

বেঁটে লোকটা এবার মোড়া ছেড়ে উঠে বলল - “কত্তা, আজ তবে আসি হ্যাঁ ! অধমের কথাটা একটু মনে করে রাখবেন । নবাবগঞ্জের বাজারে গোপী বিশ্বাসের নাম করলেই সবাই একডাকে অধমের বাসা দেখিয়ে দেবে ।”

লোকটা বেরিয়ে গেল । জটেশ্বর তখনো রাগে ফুঁসছে । ভিতর থেকে জটেশ্বরের মা জবালা দেবীর আওয়াজ এল - “ওরে জটা ! কোন আঁটকুড়ির পোয়ের সাথে সকাল সকাল হ্যাঙ্গাম বাঁধালি ? মুখুজ্যেদের ছেলেটা বুঝি ! ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার । নিশ্চয়ই তোর গান নিয়ে বলতে এয়েছিল ! যত হারামজাদার পো ! অ্যাই জটা ! গান থামালি কেন ?” এই বলে জবালা দেবী সত্যিই কোমরে আঁচল গুজে ঝাঁটা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন । “বল কোন মুখপোড়া তোকে কথা শোনায় । আজ ব্যাটারদের নিববংশ করব ।”

জবালা দেবীর বাঁ হাটুতে আরথ্রাইটিস । আজ শুক্লা চতুর্থী বলে ব্যাথাটা একটু পোষ মেনে রয়েছে । তাই জবালা দেবী বীরবিক্রমে ঝাঁটা হাতে এগিয়ে চললেন । জটেশ্বরই তার রাস্তা আটকে দাঁড়াল - “কর কি মা ! মুখুজ্যেরা তো কবে এখানকার পাট চুকিয়ে পালিয়েছে । ওসব কিছু নয় । নবাবগঞ্জ থেকে এসেছিল এক চোর, আমার হারমোনিয়ামের ওপর নজর ।”

“অ্যাঁ ! কি বললি জটা ? আমার বাগানের কালোমণি আম চুরি করতে এয়েছিল !” - জবালাদেবী কানেও একটু খাটো । “কোথায় সে হতভাগা ! আমার বাগানের আম চুরি করবে ! এতবড় আস্পদা !” জবালা দেবী ঝাঁটা হাতে আমবাগানের দিকে রওনা হলেন । জটেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তত্ত্বপোষে বসে রইল । আজকের রেওয়াজটা মাঠেই মারা গেল ।

হরনাথ ডাক্তারের ওষুধ কেউ কখনো খেয়েছে বলে শোনা যায়নি । কিন্তু তা বলে এমন নয় যে হরনাথ ডাক্তারের পসার নেই । রুগীর ভিড় তার দাওয়ায় লেগেই থাকে । কথাটা হল,

হরনাথ ডাক্তারের মোটে ওষুধ পছন্দ নয় । তার চিকিৎসা পদ্ধতি, যাকে বলে 'অচিরাচরিত' । এই যেমন পরশুদিন ব্রজকিশোরের মা এসেছিলেন কোমরের ব্যাথা নিয়ে । ব্রজকিশোরের মায়ের কোমরের ব্যাথা বহুকালের, একরকম পোষাই বলতে গেলে । কোমরের ব্যাথার সাথে তার পেয়ারের সম্পর্ক, সন্ধ্যাবেলা কোমরে তেল মালিশ করতে করতেও কোমরের ব্যাথার সাথে তার কথা চলে - “রাগ করিসনি বাপ । একটুখান তেল লাগিয়েছি বলে রাগ কর চলে যাসনে যেন!” ব্রজকিশোর জোর করেই মাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাত এসেছিল এসেছিল । তা হরডাক্তার তার ডান কনুইতে মারলেন এক হাতুড়ির বাড়ি । সেই থেকে কোমরের ব্যাথা তো গেলই, বাঁ কাঁধের একজিমা আর চোখের ছানিটাকেও সাথে করে নিয়ে গেল। শাপ শাপান্ত করতে করতে বাড়ি ফিরলেন ব্রজকিশোরের মা ।

হরনাথ ডাক্তারের নামে এমন অনেক কাহিনী গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ঘোরে, তার সত্যি মিথ্যে বিচার করা দায় । অবন ঘোষালের হয়েছিল পাথুরী, বহু ডাক্তার বদ্যি দেখানোর পরে যখন রোগ ধরা পড়ল তখন আর অপারেশন ছাড়া গতি নেই । গাঁয়ে গঞ্জে না আছে সার্জেন, না অ্যানাস্থেটিস্ট, না অপারেশন থিয়েটার । অবন ঘোষাল কলকাতা যাওয়ার তোড়জোড় করছেন, খবর গেল হরডাক্তারের কাছে । হরডাক্তারের সেই রূপ গাঁয়ের লোক কখনো দেখেনি । “কি, আমি থাকতে অবন কলকাতা গিয়ে অস্ত্র করবে! বজ্জাতটার এত সাহস !” - বলে তিনি অবন ঘোষালের বাড়ি গিয়ে চড়াও হলেন । তার মুখে তখন যেন গালির ফোয়ারা ছুটছিল । আর সে কি গালাগালির বহর ! দু মিনিটের মধ্যে অবন ঘোষাল অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন । সেই জ্ঞান ফিরল পাক্কা তিন ঘন্টা পরে ! চোখ খুলে অবন ঘোষাল দেখলেন, হরডাক্তার পাথর হাতে মিটমিট করে হাসছেন । অপারেশন সাকসেসফুল ।

আসল কথা হল হরনাথ ডাক্তারের অ্যাটাচি । হরডাক্তারের সব চিকিৎসার রহস্য ওই অ্যাটাচিতে । হরডাক্তার কারোর কাছে কথাটা ফাঁস করেননি বটে, কিন্তু অ্যাটাচি বিনা তিনি অচল । রোগীর নাড়ি ধরেই তিনি অ্যাটাচি খোলেন, আর প্রতিবারই তার ভিতরে মেলে একখানা কাগজ । আজ যেমন নেপালবাবু এসেছিলেন পেটের গোলমাল নিয়ে । নেপালবাবু

এমনিতে পেটপাতলা, তার ওপর তেলেভাজা দেখলে বিশ্বসংসার ভুলে যান। তাই তার মধ্যপ্রদেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগেই তার সর্বদা মনোযোগ। ইউনাইটেড নেশনস এর যেমন কঙ্গো, নেপালবাবুর তেমনি পেট। হরডাক্তার নেপালবাবুর নাড়ি দেখে অ্যাটাচি খুললেন। যথারীতি তার ভিতরে এক টুকরো কাগজ। যাতে লেখা 'পাথরকুচি'।

হরডাক্তার খানিকক্ষণ মন দিয়ে কাগজটা দেখলেন। কাগজের লিখন অন্যথা করার কোন কারণ আজ অন্দি ঘটেনি। তিনি কাগজটা মুড়ে গম্ভীর মুখে বললেন - “পাথরকুচি পাতা বেটে সকালে একবার খেয়ে নেবেন। বাস, এই নিদান।”

নেপালবাবু হতাশ - “তা পাথরকুচি পাতা কোথায় পাব ডাক্তারবাবু! আজকাল কি আর বলে দিলেই চলে, এই পাতা খাবেন, ওই মূল শূঁকবেন! সে জঙ্গলও নেই আর গাছও নেই। পাথরকুচি পাতা খুঁজতে হিমালয় যাব নাকি?”

“তা আমি কি জানি কোথায় পাবেন” - হরডাক্তার খেঁকিয়ে উঠলেন - “তেলেভাজা গেলার সময় মনে থাকেনা কেন? নিজের পেট বলে যাচ্ছেতাই করবেন নাকি! যেখান থেকে পারেন পাথরকুচি পাতা যোগাড় করুন।”

কিন্তু পরদিন সকালেও যখন নেপালবাবু একই সমস্যা নিয়ে এলেন, তখন হরডাক্তারের কেমন যেন সন্দেহ হল। “পাথরকুচি বেটে খেয়েছেন?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, নবাবগঞ্জের বাজার চষে পাথরকুচি পাতা যোগাড় করেছি, এই দেখুন! সকাল সকাল খানিক মকরধ্বজের সাথে বেটে এক টোঁকে গিলে ফেলেছি। তবুও পেটের টুং টাং থামে কই!”

হরডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি চশমাটা খুলে ধরা গলায় বললেন - “যা সন্দেহ করছিলাম তাই।”

নেপালবাবু প্রায় চোঁচিয়ে উঠলেন - “অ্যাঁ! ক্যান্সার! ডাক্তারবাবু আমার গরুটার যে আসছে মাসে বাছুর হবে! দেখে যেতে পারব তো!”

“দূর মশাই ক্যান্সার!” - হরডাক্তারের বিরক্তি - “ক্যান্সার হয় বড় বড় লোকেদের, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নেতাজী! আপনার মত বদ্ধজীবকে মেরে ক্যান্সার হাত ময়লা

করেনা !”

“যাক” - নেপালবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন - “তাহলে কি সন্দেহ করেছিলেন ডাক্তারবাবু?”

হরডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন - “পাথরকুচি পাতা নয়, আপনাকে পাথরকুচিই খেতে হবে।”

“অঁ্যা ! কি বললেন ডাক্তারবাবু ? কি খেতে হবে?”

হরডাক্তার আবার খেঁকিয়ে উঠলেন - “কানেও কম শোনেন নাকি ! পাথরকুচি! স্টোন চিপস ! কং করে গিলে খেয়ে নেবেন !”

নেপালবাবু কথাটাকে যেন ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না । আবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- “ইয়ে মানে বলছিলাম কি, পাথরকুচি তো মানে ঠিক, যাকে বলে, গিলে খাবার মত নয় ! পাথরের বদলে যদি পাথরের মত কিছু, অর্থাৎ কিনা অপরাধ নেবেননা, মানে আমার দ্বিতীয় পক্ষ তিলের নাড়ু বানান । তা ওই নাড়ুই বলেন আর পাথরই বলেন, ওরকম দুচারটে যদি গিলে ফেলি তবে কিছু সুরাহা...”

হরডাক্তার এবার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন - “আপনার কি মনে হয় আমি ইয়ার্কি করছি ? শখ করে আপনাকে পাথর খেতে বলছি ? লোকে আমাকে প্রাণহর ডাক্তার বলে জেনেও মহানন্দে ডাক্তারি করছি ? আমার ভাললাগে বলে? দূর হন তো এখান থেকে ! পাথরকুচি খেতে যখন একবার হুকুম এসেছে তখন খাবেন বৈকি । হুকুম অমান্য করার আমি আপনি কেউ নই ! বেরিয়ে যান, বেরোন বলছি !”

কাঁপতে কাঁপতে নেপালবাবু বেরিয়ে গেলেন । হরডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন । তারপর চশমাটা মোছার জন্য রুমাল বার করতে অ্যাটাচি খুললেন । খুলতেই থমকে গেলেন । অ্যাটাচির ভিতর এক টুকরো কাগজ ।

হরডাক্তার ঘেমে উঠলেন । সামনে রোগী না থাকলে কখনো অ্যাটাচির ভিতর কাগজ মেলেনি । কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজের ভাঁজ খুললেন। হরডাক্তারের মুখ শুকিয়ে গেল।

কাগজে লেখা - “ এখন সময় !”

মুখুজ্জ্যেদের রোয়াকে সাক্ষ্য আড্ডার মধ্যমণি শান্তিগোপাল মুখুজ্জ্য গড়গড়ায় একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন - “তোমরা খেয়াল করেছ কি না জানিনা, আজকাল গাঁয়ে অনেক নতুন লোক দেখছি।”

শিরোমণি মশাই বললেন - “তা যা বলেছেন। পরশু নবাবগঞ্জের বাজার থেকে থলি হাতে ফিরছি। হঠাৎ পিঠে পড়ল টিল! ঘুরে দেখলাম - একটা বারো তের বছরের ছোকরা গুলতি হাতে পালাচ্ছে। তখনই বুঝলাম, এ ছোঁড়া নতুন না হয়েই যায়না! আমায় চেনেনি এখনও! কাদের বাড়ির ছেলে খোঁজ নিতে হবে।”

শচীশ চৌধুরী কেশে উঠলেন - “পন্ডিতমশাই, নতুন ছোঁড়া নয়, ও আপনার স্কুলের বিশে! আমি আপনার সাথেই ছিলাম।”

“নানা, বিশে হতে যাবে কেন, বিশে তো অতি ভাল ছেলে। আপনি বরং কাস্তি কিংবা অনাদি বললেও না হয় মানা যেত। না না, ও বরং নতুন ছোঁড়াই থাক, বিশোটশে কে এর মধ্যে আনবেননা।” বিশের জ্যাঠা শিরোমণি মশাই এর পুরনো যজমান।

“রাধামাধব! মুখুজ্জ্যমশাই কথাটা ভুল বলেননি” - নকুলবাবু সায় দিলেন। “আজকাল সত্যিই মাঝেমাঝে এমন এমন সব মুখ দেখছি, কস্মিনকালে এ তল্লাটে দেখা যায়নি। গত পরশুই তো আমার দোকানে এক মক্কেল দেড় কিলো পান্তুয়া একাই সাবাড় করল। ওরকম খাইয়ে লোক শেষ দেখেছি হরিশের জ্যাঠাকে। তা তিনিও তো গতবছর অক্লা পেলেন।”

“ছোঃ” - শচীশ চৌধুরীর বিদ্রূপ - “হরিশের জ্যাঠা আবার খাইয়ে। আমার মেজমামা তিনটে পাঁঠা গিলে তবে সকালের ট্যাবলেট খেতেন। খালি পেটে ওষুধ বারণ ছিল কিনা!”

“তা সে যদি তোমরা খাইয়ের কথা বলো তাহলে আমাদের রামধন মিত্তিরই বা ...” - শিরোমণি মশাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই হস্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন হরডাক্তার। নকুলবাবু বললেন - “রাধামাধব! কি ডাক্তার! আজ কটাকে সাবড়ে এলে?”

হরডাক্তার কোন জবাব দিলেননা। ছাতাটাকে এককোণে রেখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

মুখুজ্জ্যমশাই ডাক্তারের কাঁধে হাত রেখে বললেন - “হর, সব ঠিক তো?”

হরডাক্তার হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন - “আচ্ছা, শক্তিশেল যন্ত্র কি জানেন নাকি কেউ?”

প্রশ্নটা শুনে সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শিরোমণি মশাই বললেন - “উঁহু উঁহু - শক্তিশেলং তদাত্মানং অর্বাচীনস্য আশ্ফালনং। রামায়ণে কোথাও শক্তিশেল যন্ত্রের উল্লেখ আছে বলে তো মনে করতে পারছিনে!”

শচীশ চৌধুরী বললেন - “আহা, রূপকার্থে শক্তিশেল, অর্থাৎ যে shell এর মধ্যে শক্তি। বোমাটোমা হবে বোধহয়। কেন ডাক্তারবাবু, হঠাৎ শক্তিশেল! থিয়েটারে পেল নাকি!”

হরডাক্তার ছোট এক টুকরো কাগজ পকেট থেকে বের করে সামনে মেলে ধরলেন - “বলুন দেখি এটা কোথা থেকে পেয়েছি?”

নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন কাগজের টুকরো। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা ‘শক্তিশেল যন্ত্র’। সকলেই নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

“বাগচীদের ছোটখুকির কানে পুঁতি ঢুকে গেছিল। পুঁতি বার করলাম, আর তার সাথে সাথে বেরলো এই কাগজ। বুঝলেন!”

শচীশ চৌধুরী বললেন - “ও এই কথা। ছোট মেয়ে, কানে কি না কি ঢুকিয়েছে, তা নিয়ে এত উতলা হওয়ার কি আছে?”

“তার কারণ ঢুকেছিল শুধু একটা পুঁতি, আর বেরলো সাথে একখানা কাগজ নিয়ে” - হরডাক্তার গজরাতে থাকলেন - “অশৈলী কাণ্ড সব শুরু হয়েছে।”

নকুলবাবু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। এবার আর থাকতে না পেরে বললেন - “ইয়ে মানে রাধামাধব! আমিও একটা কথা বলব বলে ভাবছিলাম। গত পরশু থেকে আমার বাড়ির বেড়ালটাও, কেমন যেন একটু অন্যরকম ভাবভঙ্গি করছে।”

“অন্যরকম বলতে?” - শচীশ চৌধুরীর প্রশ্ন।

নকুলবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে বললেন - “এই যেমন ধরুন রাধামাধব, আমার বেড়ালটা মাছ খাওয়া ধরেছে।”

“বেড়াল মাছ খেয়েছে তাতে আবার অন্যরকম কি দেখলে হে!” - শিরোমণির বক্রোক্তি -

“মার্জারস্য মৎস্যে রুচি অজে যথা মনুষ্যে - কি বলেন মুখুজ্জ্যেশাই !”

“রাধামাধব, রাধামাধব ! অমন বোষ্টম বেড়াল আপনি সাত গাঁয়ে পাবেননা । কোনকালে কিনা দুধ ভাত আর পান্তুয়া ছাড়া কিছু মুখে তুলতে দেখলামনা । সেই বেড়াল কিনা পাশের বাড়ি থেকে মুড়ো চুরি করল! রাধামাধব!”

মুখুজ্জ্যেশাই হরডান্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন - “হর, তুমি এসবের কি মানে বুঝছ বলতো? শক্তিশেল যন্ত্র বলে কি সত্যিই কিছু আছে বলে মনে হয় !”

“বুঝতে পারছিনা কিছুই” - হরডান্তার নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে বললেন - “আরো একটা ক্লু দরকার !”

সকাল সকাল দুটো কাঁচা ডিম ভেঙ্গে জুস খাওয়া হরডান্তারের বহুদিনের অভ্যাস । আজকেও রুটিনমাসিক দ্বিতীয় ডিমটা ভাঙ্গতেই একটা কাগজ ছিটকে গ্লাসের মধ্যে পড়ল । হরডান্তার খানিকক্ষণ ডিমের খোলাটা হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন । তারপর খুব সাবধানে কাগজটাকে গ্লাসের ভিতর থেকে তুলে আনলেন । কাগজে লেখা - “আরো মোলায়েম !”

সেদিন হরডান্তারের কিছুতেই ডান্তারিতে মন বসলনা । কথাদুটো তার মাথায় পাক খেতে লাগল । কিন্তু আশ্চর্যের আরো বাকি ছিল । বিকেলে চেম্বার থেকে বেরোতেই হরডান্তার দেখলেন, রাস্তার পাশে চারটে বিড়াল জটলা করছে । দৃশ্যটা এতই অদ্ভুত ঠেকল যে হরডান্তার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলেন ।

“রাধামাধব !” - নকুলবাবুর গলা শুনে হরডান্তার ফিরে তাকালেন - “চেয়ে চেয়ে কি দেখছ ডান্তার !” নকুলবাবুর এখন ঝাঁপ বন্ধ করে ফেরার সময় ।

“ইয়ে, মানে আপনি কখনো দুটোর বেশি বিড়াল একসাথে দেখেছেন ?”

“তা বোধহয় দেখেছি কখনো সখনো, অত কি মনে রাখা যায় রাধামাধব ! তা হঠাৎ বিড়ালের খোঁজ কেন ডান্তার ?”

হরডান্তারের দ্রু কুণ্ঠিত - “ ছাড়েন, আচ্ছা বলুন তো 'আরো মোলায়েম' কথাটার মানে কি?”

“এ হেঁ হে রাধামাধব – মোলায়েম মানে আরো নরম তুলতুলে আর কি ! এই যেমন ময়ানে তেল বেশি পড়ে গেলে পান্তুয়া কড়কড়ে হয়ে যায়, সেই রকম আর কি।”

“দুত্তোর, সেই মোলায়েম নয়। কোন মোলায়েম জিনিস, যেমন ধরুন গিয়ে – তোশক গদি তাকিয়া বালিশ। আর কি কি মোলায়েম আছে বলুন দেখি?”

নকুলবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন - “আরো মোলায়েম চাই, তবে তো পান্তুয়া ছেড়ে রসগোল্লা ধরতে হয়। রাধামাধব ! ও ডাক্তার, কিছু নেশাটেশা করে বসোনি তো? কিসব বকছ বলতো?”

হাটতে হাটতে দুজনে বাঁশঝাড়ের কাছে এসে পড়েছেন। হঠাৎ দেখলেন দূরে একটা আলোর হলকা সারা আকাশ লাল করে রেখেছে। নকুলবাবু থমকে গেলেন - “ও ডাক্তার, কি দেখছ? আগুন নাকি? আহা, কতদিন গাঁয়ে আগুন লাগেনি। সেই শেষবার মহিমের গোয়ালের এককোণে ফুলকি মত দেখা গেছিল, তাও কতদিন আগের কথা। আজকাল সব আগুন শহরে ভেগেছে” - নকুলবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

“থামুন তো মশাই, ওদিকে আগুন আর আপনি স্মৃতিরোমন্বনে বসলেন। ওপাড়ায় জটেশ্বরের বাড়ি খেয়াল আছে?” - হরডান্তার একটা তুমুল শোরগোল তুললেন। খানিকক্ষণের মধ্যেই লোকজন জড়ো হয়ে জটেশ্বরের বাড়ির দিকে রওনা হল।

দূর থেকেই হরডান্তার দেখতে পেলেন, জটেশ্বরের উঠোনে একটা শঙ্খ আকৃতির বস্তু চারদিক আলো করে রেখেছে। তার সামনে জবালা দেবী আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছেন। চারপাশে অন্ততঃ শতানেক বিড়াল তাকে ঘিরে রেখেছে।

“যাক রাধামাধব – আগুন নয় তাহলে” - নকুলবাবু স্বস্তির শ্বাস ফেললেন - “কিন্তু জটেশ্বরের এ কি নতুন ব্যারাম ! জটেশ্বর কি আর কাউকে না পেয়ে বিড়ালের জলসায় গান

গাইবে নাকি !”

শিরোমণি মশাই হাত থেকে জলের বালতি রেখে বললেন - “গানং করতি য স গায়কঃ ।
জটেশ্বর আবার গায়ক হল কবে ?”

শচীশ চৌধুরী বললেন - “আঃ এখন জটেশ্বরের গানের কথাটা না মনে করালেই কি
চলছেনা । কাণ্ডটা কি হচ্ছে সেটা দেখবেন তো । বিড়ালের পার্বণে জবালাদেবীর
পৌরোহিত্য !”

“আহা জটেশ্বরের খেয়াল চেপেছে বোধহয়, বিড়াল ভোজন করিয়ে পুণ্য করবে । ওরে
অতই যদি সহজ হত ! সদব্রাহ্মণ বিনা স্বর্গের পথে কেউ সঙ্গ দেবেনা রে বোকা !” -
শিরোমণির দীর্ঘশ্বাস ।

গোটা দলটা হত্তদন্ত হয়ে এগোতে থাকল । উঠোনে পৌঁছে দেখা গেল, ব্যাপার বেশ
ঘোরতর । জবালা দেবী ফুল বেলপাতা নিয়ে একটা ধাতব শঙ্কুর সামনে বসে মন দিয়ে
সন্ধ্যাহিক করছেন । দূর থেকে যা মনে হয়েছিল, তার থেকেও কয়েকগুণ বেশি বিড়াল
জায়গাটা মেলা করে রেখেছে । কিন্তু কোন মিউ মিউ ফ্যাস ফ্যাস নেই, সবাই অখন্ড
মনোযোগে ওই শঙ্কুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে । আর জটেশ্বর এক কোণে তাকিয়ায় বসে
চুপচাপ দেখছে । একটা অপার্থিব আলোয় জায়গাটা আলো হয়ে রয়েছে ।

নকুলবাবু খুব সন্তর্পণে এক পা এক পা করে এগিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন -
“কিরে জটা, এই স্বয়ম্ভূ শিবঠাকুর কোথা থেকে তুললি ! রাধামাধব ! রাধামাধব!” নকুলবাবু
একবার গড় করলেন । হরডাক্তার ভাল করে শঙ্কুটার দিকে চেয়ে দেখলেন । জিনিসটা যে
কোন ধাতুর তৈরি তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু হরডাক্তার জিনিসটার দিক এগোতেই এক
সাথে দশ বারোটা বিড়াল তার পথ আটকে দিল ।

“পারবেননা” - জটেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলল - “গত আড়াই ঘন্টা চলছে । মা তো ছেড়ে
উঠছেইনা । আর এই বিড়ালের পাল পাহারা দিচ্ছে ।”

“গত আড়াই ঘন্টা ধরে এই কাণ্ড ! বলিস কি রে জটা ! তোর গানের গুঁতোয় কি সত্যিই
কেউ পাগল হল ? আর ওই বস্তুটা কি ? কোথা থেকে ? এই বিড়ালের দলই বা কি

করছে?”

“মায়ের ধারণা স্বয়ং মা যষ্ঠী তার সাজপাজ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন । আমি তো বিকেলে মুড়ি নিয়ে বারান্দায় বেরিয়েই দেখি এই কাণ্ড চলছে ।”

“রাধামাধব !” - নকুলবাবু আবার গড় করলেন - “কে বলে কলিকালে ঈশ্বর নাকে রিফাইন্ড লাগাচ্ছেন ! আহা প্রভু ! একি লীলা ! অবশেষে কল্কি, থুড়ি শঙ্কু অবতার !”

“ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” - শিরোমণি মশাইও মাথায় হাত দিয়ে প্রণাম ঠুকলেন - “এইবারে সব অবিশ্বাসীর বেটা টের পাবে । আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড, সব বেটার মুন্ডু নিয়ে শঙ্কু অবতার গেভুয়া খেলবে !”

“খামুন তো মশাই” - হরডাক্তারের ধমক - “সব ব্যাপারে একটা বাড়াবাড়ি না করলেই হয়না ! এই গোটা ব্যাপারটার পিছনে মিস্ট্রিটা ধরতে পারছেননা ! এই এতগুলো বিড়াল মিলে ...”

“উঁহু উঁহু, বিড়াল নয়” - পিছন থেকে একটা আওয়াজ শুনে হরডাক্তার ফিরে তাকালেন । বনতুলসীর ঝোপের ভিতর থেকে গোপী বিশ্বাসের ছোটখাট চেহারাটা বেরিয়ে এল । আর তার পিছন পিছন একটা বেশ নধর গুঁপো হলোবেড়াল ।

“বিড়াল না তো কি বাঘ না কি মশাই !” - হরডাক্তারের হুঙ্কার ।

“না না বাঘ হতে যাবে কেন” - গোপী বিশ্বাস যেন কাঁচুমাচু - “অধমের ছোট মুখে বড় কথা । বাঘ নয়, তবে কিনা বিড়ালও নয় বটে । ভালুক না হতেও বাধা নেই । অর্থাৎ কিনা কিছুই নয় ।”

“হেঁয়ালি ! মস্করা হচ্ছে ! একখানা আস্ত ইউরিয়াসিটামাইন ইঞ্জেকশন ঠুকে দেব !” - হরডাক্তার ক্ষিপ্ত ।

শচীশ চৌধুরী যোগ করলেন - “বাবাজীবন, হরডাক্তারের ইঞ্জেকশন বলে কথা । ইয়ার্কি নয় । মহালয়া থেকে ভাইফোঁটা অন্দি ব্যাখায় টনটন করবে ! রয়েসয়ে কথা বলো ।”

গোপী বিশ্বাস বলল - “ওই দেখেন কতটা, খামখা রাগ করছেন । বলি, এনারা কারা সে প্রশ্নের মীমাংসা কি এতই জরুরী ! হারমোনিয়ামটা হাতের কাছে পেলেই তো সব সমস্যা

জল !”

হরডান্তার বিষম খেলেন - “হারমোনিয়াম ?”

“ইয়ে মানে জটাবাবুর গুরুদত্ত হারমোনিয়াম । জটাবাবুর হাতে একবার পড়লেই ব্যাস !

তারপরে শুধু অপেক্ষা !”

“কিসের অপেক্ষা?”

“আজ্ঞে আপনারা গুণীজন, হারমোনিয়ামে হাত লাগালেই সাত সুর খেলবে এ আর আশ্চর্য কি । কিন্তু যে সে সুর নয়, তেমন মোলায়েম সুর খুঁজে পেতে হবে । নইলেই বিপদ !”

“বিপদ!” - হরডান্তারের মাথায় আস্তে আস্তে একটা ভাবনা দানা বাঁধছিল - “ওই শঙ্কুটা কি বোমাটোমা নাকি ? এ নিশ্চয়ই কেন্দ্রের চক্রান্ত । হাইড্রোজেন বোমা এয়ারড্রপ করে গেছে !”

গোপী বিশ্বাস গলা খাঁকরে বলল - “আজ্ঞে আপনাদের আর কি বলব । ওটি ছোটখাট দেখতে হলে কি হবে, ওর নাম শক্তিশেল যন্ত্র । ঠিকঠাক সুরে সুর মিললে ওটি কাজ শুরু করবে, আর এই এনারা” - গোপী বিশ্বাস হুলোটার দিকে তাকিয়ে বলল - “ঘরে ফিরে চাটি পান্তা গিলতে পারবেন । বহুদিন এই গ্রহে পোস্টিং কিনা, আর মন টেকেনা ।”

শচীশ চৌধুরী আঁতকে উঠলেন - “এই গ্রহে ! অর্থাৎ ... ইয়াকির জায়গা পাওনা । এই গ্রহে আমিই রয়েছি বিয়াল্লিশ বছর ।”

“আজ্ঞে সাড়ে চার হাজার বছর পরেও ঘরে ফিরতে না পেলে মন কেমন করে বলেন কত্তা । এনাদেরও তো পরিবার এলোচুলে বসে রয়েছেন ।”

“সাড়ে চার হাজার বছর !” - শিরোমণি মশাই বিষম খেলেন - “সে তো দ্বাপরের শেষ আর কলির শুরু !”

“এক্সেরে ঠিক ধরেছেন কত্তা । তা বলি কি, হাতে আর বেশি সময় নেই । বেলা থাকতে থাকতে সুরটা ধরে ফেললেই ভাল হয় । নইলে আবার ...”

“নইলে কি?” - হরডান্তারের প্রশ্ন ।

“আহা ওসব অলুক্ষুণে কথা তুলছেন কেন । হারমোনিয়াম আর জটাবাবুর হাত থাকতে

কোন ভয় নেই। এখন দুর্গা বলে হারমোনিয়ামটা নিয়ে এলেই হয়। ”

“ছাই জটাবাবুর হাত” - হরডাক্তার রেগে উঠলেন - “ওর আবার সুরজ্ঞান !”

“ও ডাক্তার” - শচীশ চৌধুরী বললেন - “আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো !”

সকলেই ওপরে চাইলেন। ঈশান কোণ থেকে একটা গাঢ় বেগুনী রঙের বিশাল মেঘ আস্তে আস্তে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলছে। মুহূর্তের মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে এল।

“আর বেশি সময় নেই কত্তা, ওই ওনাদের দল এল বলে। এইবেলা রেওয়াজে বসেন জটাবাবু। তাহলেই মা ধরনী রক্ষা পায়। ”

হরডাক্তার হাঁকলেন - “অ্যাই জটা, শিগগির তোর হারমোনিয়াম নিয়ে আয়!”

“এইতো কাজের কথা বলেছেন কত্তা” - গোপী বিশ্বাসের উল্লাস - “তাছাড়া আর রাত করে কি কাজ ! ওদিকে আমার উনি আবার ভাত বেড়ে বসে রইবেন।”

জটেশ্বর বাজাতে পেরে খুব খুশি। হারমোনিয়ামটাকে খাটিয়ার ওপর রেখে বেশ জমিয়ে বসল। তারপর যেই বেলায় হাত দিতে যাবে, অমনি হরডাক্তার বললেন - “থাম। আগে ভাব বেশ নরমগোছের একটা রাগরাগিণী কি হয় বলতো ! বেশ মিষ্টি, তুলতুলে !”

“খান্নাজটাই ধরি তাহলে” - জটেশ্বর সুর ধরল। দুটো চারটে রিডে আঙ্গুল দিতেই গোপী বিশ্বাস চোঁচিয়ে উঠল - “থামেন কত্তা ! ভুল সুর ধরলেই বিপদ। এনাদের বদলে আমরাই ...” বলেই থেমে গেল - “জলদি ভাবেন কত্তা। আর বেশি সময় নাই। মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ল বলে। ”

হরডাক্তার এবার ব্যাপারটা খানিক ধরতে পারছেন। কিন্তু আশু সমস্যার সমাধান চাই। মোলায়েম সুর, মোলায়েম সুর ... কি হতে পারে ? হরডাক্তার খাটিয়ায় বসে পড়লেন। ব্যাপারটার সমাধান যে নিতান্তই জরুরী সেটা তিনি বুঝতে পারছিলেন।

বেগুনী রঙের মেঘের মধ্যে হালকা হালকা আলোর ফুলকি দেখা দিতে লাগল। আর একটা ঝাঁঝির ডাকের মত শব্দে চারদিক ভরে গেল।

“কালান্তর, কালান্তর !” - শিরোমণি মশাই পৈতেগাছা হাতে নিয়ে বললেন - “শঙ্কু অবতারের আবির্ভাব আর কলির শেষ ! কালচক্র সম্পূর্ণ হল তাহলে। এবার আবার সত্যযুগ

থেকে শুরু ।” - শিরোমণি বেশ উচ্ছসিত - “ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ, তপোবল সব ফিরে আসবে ! জয়গুরু! জয়গুরু!”

“রাধামাধব ! ” - বিষণ্ণ নকুলবাবু বললেন - “আমার চকোলেট পান্তয়ার ফর্মুলাটা মাঠেই মারা গেল ।”

জটেশ্বর আকাশের দিকে তাকিয় হতাশ সুরে বলল - “গুরু বলতেন, ভূপালীতে কখনো কড়ি ধা বাজাসনি রে জটা । তাহলেই আকাশ ভেঙ্গে পড়বে ।”

শচীশ চৌধুরী বললেন - “শিয়রে শমন, তোর এখন গুরুবাক্য মনে এল জটা ! তা জটা কড়ি ধা কোন সুর? ধা তো কোমল হয় বলেই জানি । ধাঁ করে ধা কিকরে কড়ি হয়?”

“তা আমি কি জানি ? আকাশ ভেঙ্গে পড়বে শুনে মনে এল ।”

হঠাৎ বেগুনী মেঘের ভিতর একটা বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল । আর সাথে সাথে হরডাক্তার বলে উঠলেন - “আরে জটা, শুদ্ধ স্বরের আগেরটাকেই তো কোমল বলে, আর পরেরটাকে কড়ি, তাই না? আর যা কোমল তাই তো মোলায়েম !”

“আজ্ঞে । তা বলে, কড়ি ধা আপনি এই হারমোনিয়ামে খুঁজে পাবেননা, কোন হারমোনিয়ামেই পাবেননা ।”

“আছে আছে” - হরডাক্তার লাফিয়ে উঠলেন - “নে জটা, ভূপালীটাই ধর । সাথে কোমল নি টা লাগিয়ে দিবি !”

“অ্যা, বলেন কি ডাক্তারবাবু ! ভূপালী মা নি বর্জিত ! কোমল নি লাগাব ! আর এখন কি ভূপালীর প্রহর !”

“যা বলছি জলদি কর জটা” - হরডাক্তারের আদেশ - “একটাই সুযোগ, গুরুনাম করে লেগে পড় । যা হবার হবে ।”

“হা হতোস্মি” -শিরোমণির স্বগতোক্তি - “ধনজনযৌবনগর্বং ! হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বং !

জটেশ্বর একবার কপালে প্রণাম ঠুকে হারমোনিয়ামে হাত ঠেকাল । নকুলবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন । শিরোমণি পৈতে ধরে জপে লেগে গেলেন । শচীশ চৌধুরী রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগলেন । আর হরডাক্তার কানে আঙ্গুল দিলেন ।

জটেশ্বর ভূপালীর আলাপ ধরল । প্রথমে খানিকক্ষণ সা রে গা পা ধা সা খেলিয়ে খেলিয়ে বাজাল । কিন্তু কোমল নি টা ধরলনা ।

“এজ্ঞে জটাবাবু, অপরাধ নেবেন না” - গোপী বিশ্বাস বলল - “গুণীজনের রেওয়াজে বাধা দিতে নেই । কিন্তু বলি কি, সময় তো আর নাই । একবার ক্ষমাঘোষা করে কোমল নি ছুঁইয়ে দিলেই সৃষ্টি রক্ষা পায় !”

জটেশ্বর একটা মুখব্যাদান করে ফের বাজাতে বসল । সা রে গা পেরিয়ে কোমল নি তে আঙ্গুল পরতেই যে কাণ্ডটা হল তার জন্য অবশ্য কেউই প্রস্তুত ছিলেননা ।

অর্থাৎ কিছুই হলনা ।

শুধু বেগুনী মেঘটা দু ফাঁক হয়ে গেল । তারপর মুহূর্তের জন্য একটা আলোর ঝলক ।

খানিকক্ষণ সব চুপ । শিরোমণি মশাইই প্রথমে চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন - “সব গেল কোথা? সত্যযুগ এল বুঝি?”

“ডাক্তার ! ওষুধ ধরেছে !” - নকুলবাবু উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন - “সব বাবাজি গায়েব । রাধামাধব ! ঠাকুর, আজ তবে জোড়া পান্তুয়া !”

শচীশ চৌধুরী বললেন - “যেন কখনো ছিলইনা ! একেবারে ভ্যানিশ !”

জটেশ্বর বাজনা থামিয়ে চারদিক দেখল । জবালা দেবী তখনো একমনে চোখ বুজে ধ্যান করছেন । যদিও সামনে কিছু নেই ।

“কি হে গোপী বিশ্বাস !” - হরডাক্তার বেশ মেজাজের সুরেই বললেন - “কোমল নি টাই যে কড়ি ধা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই ।” বলে পিছনে ফিরে তাকালেন । তাকিয়ে একরকম নিশ্চিত হইলেন । না, গোপী বিশ্বাস নেই ।

যেন কখনো ছিলইনা ।

শঙ্কর শেষ অবস্থা

সত্যজিৎ রায়

১২ জুলাই ২০১৪

আজ সকালে সুইডেনের প্রখ্যাত বায়োকেমিস্ট প্রফেসর মর্টেনসেনের থেকে ই-মেল পেলাম।

“প্রিয় শঙ্কু

তুমি হয়তো জানো যে গত দেড় বছর আমি বিজ্ঞানের মূলশ্রোত থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। তার কারণ এই নয় যে আমার সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। এই দেড় বছরে আমি যা সৃষ্টি করেছি, আমি হলফ করে বলতে পারি, সেটা মানবসভ্যতার ইতিহাস বদলে দেবে। আমার বাণপ্রস্থ থেকে ফিরে আসারও সময় হয়ে এসছে। বাকি পৃথিবীর কাছে এই আবিষ্কার প্রকাশ করার আগে তোমাদের কয়েকজনকে আমি দেখিয়ে নিতে চাই, তোমাদের কিছু মূল্যবান পরামর্শ থাকলে তাও শুনতে চাই। এই চিঠির সাথেই রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছি। আশাকরি তুমি আমার আমন্ত্রণ রাখবে।”

আমি ছাড়া আমার পরিচিতদের মধ্যে ক্রোলের কাছেও চিঠি গেছে। নতুন আবিষ্কারটা কি, সেটা অবশ্য ই-মেলে বলা নেই। তবে প্রফেসর মর্টেনসেনের কাজ নিয়ে আমি যতদূর পরিচিত, তার থেকে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

প্রফেসর মর্টেনসেন আমার প্রায় সমবয়সী। তথাকথিত বায়োকেমিস্টদের থেকে মর্টেনসেন অনেকটাই আলাদা। ইনভেন্টর হিসাবে আমার যতটা খ্যাতি, মলিকিউলার ন্যানো ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মর্টেনসেনের খ্যাতি প্রায় ততটাই। কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম এর মত ছোট ছোট অণু পরমাণু দিয়ে যে

সমস্ত জটিল যন্ত্রপাতি তিনি বানিয়েছেন, তা প্রায় অবিশ্বাস্য । এবং তার সমস্ত আবিষ্কারের সাইজ হল এক থেকে দশ ন্যানোমিটারের মধ্যে । এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল, মানুষের একটা লোহিত রক্তকণিকার মাপ সত্তর থেকে আশি ন্যানোমিটার । অর্থাৎ মটেনসেনের বানানো সাত আটটা যন্ত্র একটা লোহিত কণিকার মধ্যে এঁটে যায় । এককথায় বলতে গেলে, মটেনসেনের প্রতিটা আবিষ্কারই যুগান্তকারী । তার শেষ পেপার বেরোয় প্রায় দেড় বছর আগে । তাতে ভদ্রলোক একটা ন্যানো মোটরের ডিজাইন প্রকাশ করেছিলেন । এই যন্ত্র সরাসরি পরিমন্ডল থেকে তাপ শুষে নিয়ে সরাসরি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবে, কোনরকম বর্জ্য উৎপাদন না করেই । বলাই বাহুল্য, মটেনসেন যদি সত্যিই এই যন্ত্র বানাতে সফল হন, তাহলে পৃথিবীর শক্তি সমস্যা একেবারেই মিটে যাবে । কিন্তু তারপর থেকে এই নিয়ে মটেনসেনের কোন পেপারই আর বেরোয়নি, এবং মটেনসেন নিজেও একরকম নিজের বাড়িতে আত্মগোপন করেছেন ।

এই দেড় বছরে আমিও ন্যানো ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে অনেকদূর কাজ করেছি, যদিও এখনো পাবলিশ করার মত অবস্থায় কোনটাই আসেনি । আমার 'ইমিউপ্রোব' যন্ত্রটা এতদিনে প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে । এই যন্ত্র কি কাজ করে তা বলার আগে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কিকরে কাজ করে সেটা একটু বলে রাখা দরকার । যখন আমরা বলি 'শরীর খারাপ করছে' তখন তার মানে কিন্তু এই নয় যে সারা শরীরটাই খারাপ । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের কোন একটা প্রত্যঙ্গ, অথবা তার ভিতরে বিশেষ কিছু কোষের মধ্যে গোলমাল । কিন্তু শুধুমাত্র সেই কটা কোষের জন্যে তো ওষুধ দেওয়া যায়না, শরীরের প্রতি কোষে কোষেই ওষুধ ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানেও । যার ফলে সমস্ত ওষুধেরই 'সাইড এফেক্ট' দেখা যায় । 'ইমিউপ্রোব' যন্ত্র দিয়ে শরীরের যেকোন কোষের যেকোন একটা বিশেষ মলিকিউলকে টার্গেট করে সেখানে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া যায় । ফলে ওষুধের কাজও তাড়াতাড়ি হয়, আর সাইড এফেক্টও থাকেনা । এই যন্ত্র ডাক্তারির বিজ্ঞানটাকেই আমূল পালটে দিতে পারে । কিন্তু এখনো অব্দি আমার বিড়াল নিউটন ছাড়া কারোর ওপরই যন্ত্রটা পরীক্ষা করা হয়নি । তবে সাফল্য এসেছে । নিউটনের ঘুংরি কাশি এই যন্ত্র পনের

মিনিটে সারিয়ে তুলেছে।

মর্টেনসেনের চিঠিটা পেয়ে আমি বেশ খুশি হলাম। মর্টেনসেনের ম্যাজিকের ঝুলি থেকে নতুন কি আলাদীনের প্রদীপ বেরোয়, তা জানতে বেশ কৌতুহল হচ্ছিল। তাছাড়া এই সুযোগে আমার 'ইমিউপ্রোব' যন্ত্রটাও পৃথিবীর সেরা ন্যানো ইঞ্জিনিয়ারকে দেখানো যাবে। এদেশে ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে কাজ হয়না, এই ধারণাটাও ভেঙ্গে দেওয়া দরকার।

১৫ জুলাই ২০১৪

দু ঘন্টা হল মর্টেনসেনের বাড়িতে পৌঁছেছি। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই অবশ্য ঠিক। স্টকহলম থেকে বাইশ কিলোমিটার উত্তরে মর্টেনসেনের পারিবারিক এস্টেট। রাস্তাটা পার হয়ে এসেছি মর্টেনসেনের পাঠানো লিমোজিনে, সুইডিশ গ্রীষ্মের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে। মর্টেনসেনের আতিথ্যেরও ত্রুটি হয়নি। আমি আর ক্রোল ছাড়াও এক ইজিপ্টিয়ান বায়োকেমিস্টও আমন্ত্রিত। নাম হেরন আব্রন। এছাড়া একজন ফ্রেঞ্চ ন্যানোটেকনোলজিস্ট, ভিক্টর পেতি। ভিক্টরের নামটা দুজনের মধ্যে বেশি পরিচিত, তার অন্যতম কারণ কার্বন ন্যানোফিলামেন্ট নিয়ে তার গবেষণা। এছাড়াও অবশ্য ভিক্টরের খ্যাতির আরো কারণ আছে, ভিক্টর হল অ্যান্টনি ল্যাভয়সিঁয়ের সরাসরি বংশধর। হাবভাবের মধ্যে একটা বনেদী ভাব ঘোরাফেরা করে। অন্যজন, হেরন আব্রনের রিসার্চের সাথে আমরা কেউই বিশেষ পরিচিত নই।

ইউরোপের সমস্ত দেশেই খেয়াল করেছি, দুপুরের খাবার খেতে খেতে সমস্ত জরুরী আলোচনা সেরে ফেলাই রেওয়াজ। সুইডেন তার ব্যতিক্রম নয়। কাজের কথাটা মর্টেনসেন লাঞ্চার টেবিলেই পাড়ল।

“আমার আবিষ্কার তোমাদের দেখানোর আগে একটু গৌরচন্দ্রিকা করা প্রয়োজন। কথাটা এই, যে গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান যন্ত্র' তৈরি করার একটা নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছিল। প্রথম দিকে অত্যন্ত স্থূলভাবে কিছু যন্ত্র তৈরি হয়, যারা মানুষের সাথে কথা বলতে পারত, হুকুম মেনে কাজ করত, দাবা খেলতে

পারত, স্কুলের হোমওয়ার্ক করে দিত, এমনি নানারকম । এই প্রথম জেনারেশনের রোবটদের বুদ্ধিমান বলা যায়না মোটেও, কারণ 'ইন্টেলিজেন্স' এর যা প্রাথমিক শর্ত, সেটা এদের মধ্যে ছিলনা । শিথিয়ে দেওয়া কাজের বাইরে কোন কিছুই এরা করতে পারেনা । কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকেই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাবনাচিন্তার এক আমূল পরিবর্তন ঘটে । আর তার কারণ – ব্রেন । মানুষের মস্তিষ্কেই যদি বুদ্ধির চরম সীমা মনে করি, তবে 'ব্রেনের মত' কোন যন্ত্র কিভাবে বানানো যায়? মস্তিষ্ক কোন একটা যন্ত্র নয়, কোটি কোটি নিউরনের সমাহার । তাদের সন্মিলিত সাইন্যাপটিক তড়িৎপ্রবাহই আমাদের 'বুদ্ধি' হয়ে দেখা দেয় । সেই থেকে 'নিউরাল নেটওয়ার্ক' বানানোর প্রচেষ্টায় পৃথিবীর তাবৎ বৈজ্ঞানিক লেগে পড়েন । সোজা কথায়, 'নিউরাল নেটওয়ার্ক' হল অনেকগুলো ছোট ছোট যন্ত্র বা 'নিউরোন' এর সমাবেশ, যাদের পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে এমন কিছু বেরিয়ে আসবে, যা এই যন্ত্রগুলোকে আগে থেকে শিথিয়ে রাখা হয়নি । অর্থাৎ 'ইন্টেলিজেন্স' ।”

আমি লক্ষ্য করছিলাম, কথাগুলোর সাথে সাথে ক্রোলের চোখ বড় বড় হয়ে এসেছিল । এবার সে সোজাসুজি প্রশ্ন করেই ফেলল – “তুমি কি নিউরাল নেটওয়ার্ক বানিয়েছ ?” মর্টেনসেনের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি । “আমি যে প্রথম তা দাবী করছি না । কম্পিউটারের পর্দায় আমার আগেও নিউরাল নেটওয়ার্ক অনেকেই বানিয়েছে । কিন্তু হাতেকলমে, অর্থাৎ সত্যিই বাস্তব জগতে সাড়ে বারশো বিলিয়ন নিউরোন তৈরি করে কাজটা কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই ।”

“সাড়ে বারশো বিলিয়ন নিউরোন” – ভিক্টরের বিস্ময় – “অর্থাৎ তুমি সত্যিই সাড়ে বারশো নিউরোন একটা একটা করে বানিয়েছ ।”

“তুমি ভুলে যাচ্ছে মর্টেনসেন দুনিয়ার সেরা ন্যানো ইঞ্জিনিয়ার” – আমি ভিক্টরকে মনে করিয়ে দিলাম – “আমার যতদূর ধারণা তোমার কোন একটা মলিকিউলার অ্যাসেম্বলার একেকটা করে নিউরোন তৈরি করেছে ।”

“ঠিক তাই, প্রাথমিক ডিজাইন হয়ে যাওয়ার পর বাকি কাজটা শুধু রিপিটিশন । প্রথমে আমার মাথায় ছিল কার্বন দিয়ে ইউনিটগুলো তৈরি করা । মলিকিউলার কার্বনে আমার

সাফল্যের কথা তোমরা সবাই জানো । কিন্তু পরে আমার মাথায় এল, এই নিউরোনগুলোর কাঠামোটা যদি কার্বন না হয়ে সিলিকন দিয়ে তৈরি করি, তবে আমি সিলিকনের একটা বিশেষ ধর্মকে ব্যবহার করতে পারব ।”

“অর্ধপরিবাহিতা” - এবার হেরন বলে উঠল - “সেমিকন্ডাক্টেন্স ।”

“রাইট ! সিলিকনের এই ধর্ম ব্যবহার করে সমস্ত আধুনিক কম্পিউটার চলছে । আমার লক্ষ্য ছিল, সিলিকনের কোটি কোটি ন্যানোচিপ তৈরি করে সেগুলোকেই নিউরোন হিসাবে ব্যবহার করা । আমার নিউরোন গুলোকে এক কথায় ন্যানো ট্রানসিস্টর বলতে পারো ।”

মর্টেনসেনের কথাগুলো আমরা চারজনই স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম । এবার ক্রোল প্রশ্ন করল -

“অর্থাৎ তোমার নিউরাল নেটওয়ার্ক আসলে একটা বিরাট বড় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট । আয়তন ও সংখ্যার দিক ছাড়া এর সাথে একটা কম্পিউটার প্রসেসরের তফাৎ কোথায় ?”

মর্টেনসেনের ঠোঁটের কোণে আলতো হাসির ছোঁয়া লাগল । “প্রফেসর ক্রোল, এই একই প্রশ্ন যদি তোমায় করি ? একটা প্রসেসর আর তোমার ব্রেনের কি তফাৎ ?”

অকস্মাৎ এমন একটা প্রশ্নে ক্রোল খতমত খেয়ে গেল । তারপর বলল - “প্রফেসর মর্টেনসেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছ তা এখনো বুঝতে পারছি না । কিন্তু আশা করি বাড়ি বয়ে এনে অপমান করাটা তোমার উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়েনা ।”

“একজ্যাক্টলি !” - মর্টেনসেনের প্রত্যুত্তর - “একটা প্রসেসরের সাথে আমার নিউরাল নেটওয়ার্কেরও এটাই তফাৎ । কিন্তু আর কথা নয় । তোমরা এবার নিজেদের ঘরে বিশ্রাম করো । কাল সকালে আমার নিউরাল নেটওয়ার্কের ডেমনস্ট্রেশন ।”

রাতে ডিনার টেবিলে বসে আমার ইমিউপ্রোব যন্ত্রটা সবাইকে দেখালাম । প্রায় দু বছর আগে এরকম একটা যন্ত্রের প্রাথমিক ডিজাইন 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম । যন্ত্রটা সত্যিই হাতে কলমে দেখে সবাই দেখলাম বেশ উৎসাহী । এমনকি কিছুক্ষণের জন্য মর্টেনসেনের নিউরাল নেটওয়ার্কের আলোচনাও চাপা পড়ে গেল ।

ঘরে ফিরে বিছানায় শুতে যাব যাব করছি । হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে উঠে দরজা খুললাম । ক্রোল । রাগত চোখে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল ।

“শঙ্কু, তোমার স্বভাব আর গেলনা । এই বাজারের মাঝে এমন একটা যন্ত্র কি দেখাতে আছে? বিশেষতঃ যখন তথাকথিত 'সেরা ন্যানোইঞ্জিনিয়ার' তোমার আবিষ্কারটা গোল গোল চোখ করে গিলছে ! মটেনসেনের শকুনের স্বভাব, ওর চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি ।”

ক্রোল এসব নিয়ে একটু বেশিই রিঅ্যাক্ট করে, আমি বিশেষ আমল দিলামনা - “তোমার কি ধারণা ও যন্ত্রটা চুরি করবে ? তাতে ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়ে যাবেনা ! তাছাড়া দু বছর আগে এর ডিজাইন আমিই পাবলিশ করেছি । এখন এই যন্ত্র দখল করে মটেনসেনের খুব একটা লাভ নেই !”

ক্রোলের তবুও রাগ পড়লনা - “তোমার কি ধারণা, মটেনসেন আমাদের এখানে কি করতে ডেকেছে ?”

“আমি এর পিছনে কোন গুট উদ্দেশ্য দেখতে পাইনা । তাছাড়া তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই । বিজ্ঞানের জগতে মটেনসেনের ভদ্রলোক বলে খ্যাতি আছে ।”

সেরাতে ক্রোল যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ আমার ঘুম এলনা । কাল কি দেখব তার ভাবনাতেই অনেকক্ষণ জগে রইলাম ।

১৬ জুলাই ২০১৪

মটেনসেনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়ে আমার সন্দেহ কোনকালেই ছিলনা । কিন্তু আজ যা দেখলাম তার পরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিজ্ঞানের ইতিহাসে মটেনসেনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ।

সকাল দশটার সময় মটেনসেনের ল্যাবরেটরির সামনে সবাই একজোট হলাম । দুটো কাঁচের দরজা পেরিয়ে যা দেখলাম তা সত্যিই অবর্ণনীয় । একটা পুরোপুরি কাঁচের ঘর, এমনকি মেঝেটা পর্যন্ত কাঁচের । তার ভিতরে একটা চকচকে কাঁচের মত অর্ধস্বচ্ছ বস্তু,

প্রাণী বলাই বোধহয় উচিত, সারা ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে । বস্তুটার কোন বিশেষ আকৃতি কি মাপ নেই, একটা বিশালকায় অ্যামিবার মত এপাশ থেকে ওপাশ করছে, কখনো এদিক থেকে একটা পা তৈরি হচ্ছে তো কখনো ওদিক থেকে একটা লেজ । সারা ঘর তার বিচ্ছুরিত আলোতে ঝলমল করছে ।

আমি বাকিদের দিকে চাইলাম । সবার অবস্থা আমার মতোই । প্রাণিটার থেকে কেউই চোখ ফেরাতে পারছেননা । মর্টেনসেন যে শুধু নিউরাল নেটওয়ার্ক নয়, সিলিকনের তৈরি একটা নতুন ধরনের জীব তৈরি করেছেন, তা নিয়ে কারোরই সন্দেহ নেই ।

“ভদ্রমহোদয়গণ” - মর্টেনসেন শুরু করলেন - “তোমাদের সামনে রয়েছে পৃথিবীর প্রথম প্রাণী যা কার্বন দিয়ে তৈরি নয় । আমি 'প্রাণী' বলছি তার প্রমাণ – যখন আমি তৈরি করেছিলাম তখন এতে ছিল মাত্র এক মিলিয়ন নিউরোন, আয়তনে একটা টেনিস বলের মত । সেই অবস্থা থেকে এই প্রাণী নিজেই এত বড় হয়েছে, অর্থাৎ বাকি সমস্ত নিউরোন এর নিজের তৈরি !”

ভিক্টর মুগ্ধ ভাবটা কাটিয়ে উঠে প্রশ্ন করল - “ইয়ে, মানে এই প্রাণী বাকি নিউরোন কিসের থেকে তৈরি করল ... অর্থাৎ কি খেয়ে বড় হয়েছে ?”

“কাঁচ । যেহেতু কাঁচ হল সিলিকনের অক্সাইড, কাঁচের থেকে সিলিকন জুড়ে জুড়ে এর বৃদ্ধি । বলতে গেলে এই ঘরটাই এর খাবার । আমি এতদিনে চারবার নতুন কাঁচের দেওয়াল লাগিয়েছি, প্রতিটাই আগের থেকে বড় মাপের । আপাতত এই মাপেই কিছুদিন আছে ; এই প্রাণী খাবার, অর্থাৎ সিলিকন ছাড়াও যে বেঁচে থাকতে পারে তা তো দেখছিই ।”

“এর এনার্জি সোর্স কি ? মেটাবলিজম? ”

“এই প্রাণী পারিপার্শ্বিকের তাপ থেকে সরাসরি শক্তি শুষে নিয়ে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে ।” মর্টেনসেন কথাটা বলার সাথে সাথেই একটা সামান্য, প্রায় অবোধ্য শৈত্য অনুভব করলাম । এই ঘরটা যে বাইরের চেয়ে সামান্য ঠান্ডা সেটা এখনই বুঝতে পারলাম ।

ক্রোল সন্দিক্ধ চোখে মর্টেনসেনের প্রাণিটাকে দেখছিল । এবার বলল - “এই প্রাণী কি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে?”

“অবশ্যই !”

“মাইনাস ওয়ানের বর্গমূল কি?” - হেরনই প্রথম প্রশ্ন করল। কোন উত্তর এলনা অবশ্য।

“তোমাদের বলে রাখা উচিত, এই প্রাণিকে এখনো বীজগণিত শেখানো হয়নি। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, অর্থাৎ পাটিগণিতটাই আয়ত্ত হয়েছে। আর খানিকটা জ্যামিতি শেখাতে পেরেছি।” - মর্টেনসেন বলল।

“দেড়খানা মুরগি যদি দেড়দিনে দেড়খানা ডিম পাড়ে, তবে নটা মুরগি নয় দিনে কটা ডিম পাড়বে?” - ক্রোলের প্রশ্ন।

একটা গমগমে স্বরে উত্তর এল - “চুয়ান্ন।”

আওয়াজটা কিসের থেকে এল বোঝার চেষ্টা করলাম। ক্রোল আবার প্রশ্ন করল - “একত্রিশ লাখ দশ হাজার আটশো পয়ত্রিশের সবকটা মৌলিক উৎপাদক কি কি?”

এবারে উত্তরটা শুনে বুঝতে পারলাম, প্রাণিটার নিউরোন গুলোর সম্মিলিত কম্পনে আওয়াজটা তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রাণী নিজের থেকেই একটা স্বরযন্ত্র তৈরি করেছে।

আরো খানিকক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পরে বোঝা গেল, এই প্রাণির ভাবনাচিন্তা যদিও খুব দ্রুত, প্রায় সুপারকম্পিউটারের কাছাকাছি, কিন্তু এর জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। একটা ক্লাস সিক্সের বাচ্চাও একে কুইজে হারিয়ে দেবে। এই প্রাণির পিছনে মর্টেনসেনের এখনো অনেক খাটনি বাকি সেটা বুঝতে পারছিলাম।

১৭ জুলাই ২০১৪

ক্রোলের আশঙ্কাই সত্যি। আমার ইমিউপ্রোব যন্ত্র চুরি গেছে।

মর্টেনসেনের হাবভাবে অবশ্য এমন কিছু সন্দেহজনক এখনো প্রকাশ পায়নি। তবে ওর ওপরেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়, এবিষয়ে ক্রোলের সাথে আমি একমত।

গতকাল রাতে ডিনারের পরে যন্ত্রটার কথা মনেই ছিলনা। সকালে উঠে আলমারি খুলেই প্রথমেই চোখে পড়ল, জিনিসটা আর নেই। আমার ঘরের চাবি আমার কাছেই থাকে, আর

একটা মর্টেনসেনের চাকরের কাছে ।

ব্রেকফাস্টের সময় কথাটা তুলতেই মর্টেনসেন বেশ গভীর হয়ে গেল । তৎক্ষণাৎ মর্টেনসেনের চাকরের ডাক পড়ল । যথারীতি সে জানাল, গতকাল সারারাত চাষি তার কাছেই ছিল ।

ক্রোল আমার কানে চুপিচুপি বলল - “পুলিশে রিপোর্ট করে দাও । বজ্জাতটার একটা সাজা হওয়া উচিত ।”

কিন্তু আমি জানতাম সুইডিশ পুলিশ এব্যাপারে আমায় বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারবেনা । বিশেষতঃ আসামী যখন স্বয়ং মর্টেনসেন ।

তবে আমার এমন কিছু বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে এমনও নয় । ক্লপিন্ট আমার ঘরে পড়েই আছে । আরেকটা বানিয়ে নেওয়া কিছু কঠিন নয় । শুধু ভাবতে খারাপ লাগছে মর্টেনসেনের মত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এমন একটা কাজ করতে পারে । কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরাও মানুষ, যশ অর্থ প্রতিপত্তির লোভ কার না হয় !

দুপুরে লাঞ্চার পর ক্রোল আর আমি এসব আলোচনাই করছিলাম । এমন সময় হত্তদন্ত হয়ে আমাদের ঘরে ঢুকল হেরন ।

“তোমরা মর্টেনসেনের সম্পর্কে কতটুকু জানো?”

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় আমরা দুজনেই অবাক হয়ে গেলাম । তাহলে কি হেরনও মর্টেনসেন কেই সন্দেহ করছে?

“এখানে আমরা আসার দু সপ্তাহ আগে থেকে মর্টেনসেনের তিনজন চাকর নিখোঁজ! এবং তিনজনই একসাথে ওই সপ্তাহেই চাকরিতে বহাল হয়েছিল ।”

“পুলিশে রিপোর্ট হয়নি ?”

হেরন ঠোঁটের কোণে হাসল । তারপর বলল - “আমার সন্দেহ হচ্ছে মর্টেনসেন কিছু একটা লুকোচ্ছে । এবং সেটা ওর প্রাণী নিয়ে । আচ্ছা, তোমাদের মনে হয়না, প্রাণীটা এত বোকা কেন?”

প্রাণীটার বুদ্ধি যে নিতান্তই সাধারণ গোছের সেটা তো কাল বুঝতেই পেরেছি । কিন্তু তার সাথে মর্টেনসেনের চাকরের কি সম্পর্ক?

“মটেনসেন নিজে বারোটা ভাষা জানে, প্রাণীটাকে কেন দুটোর বেশি শেখাতে পারেনি ? কেন অ্যালজেব্রা জ্যামিতি ইতিহাস কেমিস্ট্রি ফিজিক্স – কিছুই জানেনা প্রাণিটা ! একটা হাবাগোবা কৃত্রিম প্রাণী তৈরি করা নিশ্চয়ই মটেনসেনের উদ্দেশ্য ছিলনা ।”

“অর্থাৎ কোথাও একটা গিয়ে মটেনসেন আটকে গেছে” - ক্রোল মাথা নেড়ে বলল ।
“যার জন্য ওর যন্ত্রটা দরকার ।”

“এবং যার জন্য ও আমাদের এখানে ডেকেছে । কিন্তু খোলসা করে কিছুই বলছেননা ।”

কথাটা আমার তেমন মনে ধরলনা । মটেনসেন ওর চিঠিতে ইমিউপ্রোব যন্ত্রটা নিয়ে আসার কথা কিছুই বলেনি । এমন কোন যন্ত্র যে আমি বানিয়েছি ওর জানার কথাই নয় । তাছাড়া যদি আমার যন্ত্রটাই দরকার, তাহলে বাকি তিনজনকে ও ডাকবে কেন ?

বিকেলে মটেনসেনের প্রাণিটাকে আরেকবার দেখতে গেলাম । দেখলাম ভিক্টর খুব উৎসাহ নিয়ে প্রাণিটাকে ফ্রেঞ্চ শেখাতে বসেছে । কিন্তু ওদের সংলাপ শুনে ফলাফল খুব আশাব্যঞ্জক মনে হলনা ।

“নিতান্তই ইডিয়ট একটা” - ভিক্টর খানিকক্ষণ পরে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল - “নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা একেবারেই নেই । যেকোন দুটো বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক, অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশন, প্রাণিটা ধরতেই পারেনা । একটা শব্দ আর সেই জিনিসটাকে সামনে দেখালেও কিছুই মাথায় ঢোকেনা । মটেনসেন যে কিকরে একে অঙ্ক আর ইংরিজিটা শিখিয়েছে ভগবানই জানেন ।”

ক্রোল আমার কানে কানে বলল - “আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই ধোঁকাবাজি! ওটা আদৌ মটেনসেনের তৈরি নয় ! অথবা ওটা আসলে কোন প্রাণিই নয় ! একটা বড়সড় কম্পিউটার মাত্র !”

সেদিন রাতে মাথায় অনেক প্রশ্ন নিয়েই শুতে গেলাম ।

১৮ জুলাই ২০১৪

আমার ছেচল্লিশ বছরে যে কবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, আজকের ঘটনাটা তার মধ্যে

অন্যতম ।

মর্টেনসেনের গুট উদ্দেশ্য কি ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেছিল । হঠাৎ একটা আত্ননাদ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম । আওজটা আসছে মর্টেনসেনের কাঁচের ঘরের দিক থেকে ।

ভিক্টরের গলা ।

দরজা খুলে দেখলাম, ক্রোলও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে । দুজনে ছুটতে ছুটতে মর্টেনসেনের ল্যাবের দিকে রওনা হলাম । একদম বাইরের লোহার দরজাটা দেখলাম হাট করে খোলা । পরের দুটো কাঁচের দরজা পেরিয়ে প্রাণিটার ঘরের কাছে পৌঁছতেই একটা যে দৃশ্য দেখলাম, তার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে পারবনা ।

কাঁচের ঘরটা শতখন্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে । আর তার ভিতর এককোণে পড়ে রয়েছে ভিক্টরের নিখর দেহটা । তাতে যে প্রাণ নেই দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ।

হঠাৎ একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক খেলে গেল । আর আমার পিছন থেকে একট গমগমে গলা পরিষ্কার ফরাসীতে বলে উঠল - “অভিনন্দন !”

সাহিত্যের ভাষায় কি বলে জানিনা, কিন্তু শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা বরফের টুকরো গলতে গলতে নেমে গেল । আন্তে আন্তে পিছনে ফিরলাম । মর্টেনসেনের প্রাণী কাঁচের দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে । আরো আশ্চর্য, বোকাসোকা প্রাণিটার মধ্যে একটা দুর্বোধ চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে । যেন সদ্য নতুন কিছুর স্বাদ পেয়েছে ।

আমার বিপদ কতদূর ঘনিয়েছে, সেটা তখনো মাথায় আসেনি । টের পেলাম যখন দেখলাম কাঁচের দরজার বাইরে থেকে ক্রোল ক্রমাগত দেওয়ালে কিল মারছে আর আমার পায়ের দিকে দেখাচ্ছে । নিচে তাকিয়ে দেখলাম, প্রাণিটার লম্বা লম্বা ক্ষণপদ একটা সাপের মত আমার পা জড়িয়ে উঠছে ।

আর গমগমে ফরাসীতে যে শব্দটা ভেসে এল তার কাছাকাছি বাংলা করলে হয় - “জ্ঞানতৃষ্ণা ।”

আমায় পাক দিতে দিতে প্রাণিটা উঠতে থাকল । টের পাচ্ছিলাম, ঠান্ডায় আমার পা দুটো অবশ হয়ে আসছে । মনে পড়ল, মর্টেনসেন বলেছিল পরিবেশের তাপই এই প্রাণিকে

চালায় ।

আমার অবচেতন অবস্থাতেও দেখতে পাচ্ছিলাম, ক্রোল কাঁচের দরজাটা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকল । কিন্তু ... না, প্রাণিটা ক্রোলকেও একইভাবে জড়িয়ে নিল । পালাবার পথ নেই । আড়চোখে একবার ভিক্টরের মৃতদেহটার দিকে তাকালাম ।

সারাদিন শেখানোর পরেও যখন ফ্রেন্স শেখানো যায়নি, তখন এই প্রাণি তার জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক পথ বেছে নিয়েছে । অর্থাৎ গুরুকে সরাসরিই গ্রাস করেছে । ভিক্টরের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা এখন যে এই প্রাণীর ভিতর, তা বুঝতে পারছিলাম ।

মর্টেনসেনের তিন চাকরের কি গতি হয়েছে তাও বুঝলাম । প্রাণিটার সর্পিলা পা গুলো তখন আমার বুকে উঠে এসেছে । ঠান্ডায় আমার শ্বাস বন্ধ, চিন্তাশক্তি প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে । এই তবে শেষ ।

তাহলে এখানে পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিকদের ডাকার পিছনে মর্টেনসেনের উদ্দেশ্য এই !
খাবার হিসাবে !

চেতনা পুরোপুরি চলে যাবার আগে দেখতে পেলাম, কাঁচের দরজা পেরিয়ে ঢুকল হেরন অ্যাব্রন ।

তার হাতে আমার ইমিউপ্রোব যন্ত্র ।

তারপর আর মনে নেই ।

২০ জুলাই ২০১৪

স্টকহম এয়ারপোর্ট । আমি আর ক্রোল লাউঞ্জে বসে আছি ।

মর্টেনসেন তার সমস্ত দোষ স্বীকার করে আপাতত পুলিশি হেপাজতে । ভিক্টরের বাড়িতে খবর চলে গেছে । ন্যানোটেকনোলজির জগতে এই অপূরণীয় ক্ষতিতে বৈজ্ঞানিক মহলে হইচই পড়ে গেছে ।

আর আমার ইমিউপ্রোব যন্ত্র আমার পকেটে ।

হেরনের প্রত্যাশনমতিত্ব যে আমাদের দুজনের প্রাণ বাঁচিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই ।

মটেন্সেনের প্রাণির প্রতিটা নিউরোন এক একটা ট্রানজিস্টর, অর্থাৎ সিলিকনের পাত । আর একটা সিলিকন দিয়ে তৈরি অর্ধপরিবাহীকে বিকল করার সবচেয়ে সহজ কায়দাটাই হেরন প্রয়োগ করেছিল । অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে 'ডোপিং' । খানিক ফটকিরি জলে গুলে অ্যালুমিনিয়াম আয়নের সলিউশন বানানো । তারপর সেটাকে প্রাণিটার প্রতি নিউরোনে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছিল আমার ইমিউপ্রোব যন্ত্র ।
এরপর বোধহয় যন্ত্র চুরির অপরাধটা ক্ষমা করাই যায় ।

আ র – সা লা ন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রোজ কলেজে যাই আসি। নিউ আলিপুরের মোড়ে বিরাট বড় দোকান রোজই ডাকে ।
যাওয়ার পথে সকাল নটার সময় নিঃবুম। আসার সময় বিকেল পাঁচটায় জাফরানে
জমজমাট। খুশবুখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বার্মা । একেবারে রাস্তার উপরেই সুদৃশ্য
কাঁচের রান্নাঘর। শিক কাবাব বলছে – শিকেয় তোল যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব । তন্দুরী বলছে তন্দুরন্ত
হতে গেলে চাখতেই হবে আমার অমোঘ আশ্বাদ। হঠাৎ ঘামে ভেজা বাসের সিটে বসে
নাকে বসন্তবায়ের মত বিরিয়ানির সুবাস এলে চরিত্র চলকে ওঠে, ইড়া পিঙ্গলায় টান পড়ে,
হরমোনেরা হাহাকার করে ওঠে। মনে হয় ব্রহ্ম মিথ্যা মার্টিন সত্য, কোলেস্টেরল মিথ্যা
কিমাই ঈশ্বর। অন্তরের আহ্বান আসে – আর কতকাল have not দেব মত সকাল বিকেল
ভাত আর ট্যাঁড়সসেদ্ধ গিলবি! এই ট্রাইগ্লিসেরাইডের মহাসাগরে একবার প্রাণ ভরে অবগাহন
করে নে। চার দিনকি চাঁদনী ইয়ে জওয়ানি ফ্যান্টাসি । এরপরে ডাক্তারে বলে দেবে বুড়ো
আঙ্গুল ছাড়া সব খাওয়া বারণ। রোদ থাকতে থাকতে খড় শুকিয়ে নে ।

ভয় পাই। কবি কলকঠে গেয়ে উঠেছেন খেতে পারি কিন্তু কেন খাব। তাই রোজই
প্রেয়সীদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিই। আমি কিনা কমরেডের নাতি, সাজ্জা সোশালিস্ট,
সর্বহারার সরবিট্রেট – সেই আমি কি আর-সালানে বিরিয়ানি খাওয়ার মত বুঁজোঁয়াপনা
করতে পারি। হে ভারত ভুলিও না মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী তোমার রক্ত, তোমার
ভাই। কেউ যদি বেশি খাও খাওয়ার হিসেব নাও কেননা অনেক লোক ভাল করে খায়না ।
অতএব মন চলো নিজ নিকেতন্মে দীর্ঘশ্বাসের মালা গেঁথে (ভাঁশাটা কেমন দিলাম বাব্বা)
রোজই অন্তরে অতৃপ্তি নিয়ে সিন্ত্ত্বপনে দেখি আরসালানের অনির্বচনীয় আরাকান-
চিকেন। সেই নার্সারি থেকে শুরু ।

প্রেম নেই। অরাক জলপান সেরে যখন নিউ আলিপুরের ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীরা চোস্তু ইঞ্জিরি বলতে বলতে আরসালানের গোপন জঠরান্তু থেকে ছটকাতে ছটকাতে বেরিয়ে আসে, তখন জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে। ফুটপাথের যীশু চটের বস্তায় ঘুমিয়ে গেছে তন্দুরের কয়লা নিবু নিবু। আরসালানের এখন অন্য রূপ। সাদা মার্বেলের উপর পথচারীর মুগুর ছাপ কাদার ছোপ সাফ করেছে একমাত্র জাগ্রত কর্মচারী একে একে নিবিছে দেউটি।

রাত ঘুমিয়ে পড়ে ওই। আবার দিনের আলোয় মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা। সারাদিনের অকাজ শেষে বাসের সিটে আবার আরসালান। একবার উঁকি দিয়ে দেখব নাকি, বিধির বাঁধন কাটব আমি কি এমনই শক্তিমান? সাধু সাবধান, গড়ে তোলা ব্যারিকেড। আমি দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণির রক্তে লাল। আমি শুনেছি মৃতবৎসা ছাগের কান্না। দূর! কাকে ভোলাচ্ছি? খাব খাব করেছে আমার পাগলা মন, যুক্তি চাইলে চার্বাক থেকে নিংশে অন্দি সব শুনিয়ে দেব। থাক পড়ে আমার মিডল ক্লাস বাসের সিট, আজ বিকেলে আমি একদিনের হারুন অল রশিদ দোপেঁয়াজি। চল ছনো।

দোকানের দুই ভাগ – আউটডোর আর ইনডোর। আউটডোরে রোলের কাউন্টার, সেখানে খদ্দেরের নাম ‘দাদা’। বাহুডোরে বেঁধে ইনডোরে গেলেই দাদা হয়ে যান ‘স্যর’। ইনডোরের মধ্যে আবার ওয়ার্ড এবং ওটি দুই ভাগ। যেখানে ছজনের চেয়ার টেবিলে আন্ডা বাচ্চা নিয়ে দম্পতিরা মোচ্ছব করেন সেটা ওয়ার্ড। আর ক্লোজড ডোরে ডাবল সীটার হল ওটি। লক্ষ্যনীয় যে আমার মত একলা লক্ষ্মণের জন্য এক চেয়ারের ব্যবস্থা নেই। মিনিমাম চারজনের টেবিলে বসে আমার একাকীত্বকেই প্রবলভাবে বিজ্ঞাপিত করতে হবে। তা হোক। তন্দুরী হাতে আবার একাকিত্ব! স্বর্গে লোকে একা হয়, নরকে আবার একা কি?

ঠান্ডা ঘর, মৃদু মোজার্ট (বা ওরকমই কেউ একজন), টুংটাং গ্লাসের আওয়াজ, কলকল জন ভরার শব্দ। বেয়াড়ার স্মিতবদান্যততা। আমার সামনের টেবিলে একজন শালপ্রাংশু ব্যুটোরস্ক মহাবাহু অমিতোদর মাড়োয়াড়ি বসে দুহাতে মুরগি চিবোচ্ছে ঝালের চোটে

হাঁসফাঁস করছে আর খালি কাগজের ন্যাপকিনে নাক মুছেছে, তারপর আবার আর এক কামড়। গালদুটো টকটকে লাল, ঝাল লেগে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, তবু ওই মুরগি ওকে ছাড়বেনা। আন্তপ্রজাতি সংগ্রাম। এপাশে আবার এক মুশকো মহিলা চিকেন চাপের ঝোল ঢেলে বিরিয়ানিতে চটকে মাখছেন। বাচ্চাকে খাওয়াতে হচ্ছে অতএব বিরিয়ানির দলা জলে ভিজিয়ে ঝাল কমিয়ে গেলার ব্যবস্থা। গ্লোবলাইজেশন। এরপর হয়তো পাশে হাতপাখা নিয়ে বসবেন। ছেলে চিবালো হাড় জুড়ালো মুরগি গেল পেটে। চারিদিকে কেমন ইনসুলিন ইনসুলিন পরিবেশ, চোঁয়া ঢেকুর, কড়কড় হাড় চিবানোর আওয়াজ, পেপাসিন ট্রিপসিনের পোয়াবারো। যত অন্তঃক্ষরা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি আছে সব একসাথে কাজে নেমেছে। বড় ধুম লেগেছে হৃদয়কমলে।

কি খাব, কি খাব? এবার কালী তোমায় খাব ! নিয়ে আয় দেখি মেনুকার্ড, আজ যদি দ্বিতীয় ইন্দ্রের মত দধীচিরূপ পাঁঠার অস্থিতে বজ্র না বানিয়েছি তবে আমিও প্রলেতারিয়েত নই। কোরমা কালিয়া পোলাও জলদি লাও জলদি লাও। আরেবাস, ‘চিকেন মনসুখানি’ আবার কি জিনিস? ক্যান্টার কেস করে দিয়েছ বস। সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে হে মুগ্ধ জননী, রেঁধেছ চিকেন শুধু, নহে মনসুখানি। আজ তবে ঝোলে জিভে পরিচয়টা হয়েই যাক। যদি চলেবল হয় তবে পরের সপ্তাহে এগজ্যামিনারকে খাওয়াতে কাজে লাগবে। হুঁই বাবা, এম ডি পরীক্ষা বলে কথা। পড়বে পিজি বাঁশ দেবনা তাই কখনো হয়? উচিতমতো মাল পেটে পড়লে ডিগ্রি দেওয়ার কথা ভাবব, তারপর ফার্মাকোলজিটাই ... যাকগে।

এল ওই পূর্ণশশী আমার মনরাত্ন পানে ধ্যেয়ে। একি, তোমায় কেন লাগছে এত চেনা? পাড়ার পিকনিকে সিদ্ধ মাংসে আলুর দমের ঝোল ঢেলে যে ঘন্ট পাকানো হয়, তার উর্দু নাম বুঝি মনসুখানি? হবেও বা। আমি মুখ্যসুখ্য বাঙ্গালি, রেস্তোরাঁয় শিঙ্গিমাছের ঝোল খেলেই খুশি, যদি তার নাম হয় শিকঞ্জি শিঙ্গালানা বা ওরকম কিছু একটা। অতএব দধীচির বদলে দধিকর্মা, বিরিয়ানির বদলে বিড়িই সই। নিত্যকর্ম পদ্ধতির মত ব্যাজার মুখে বিষয়কর্মে

(অর্থাৎ গলাধঃকরণে) মন দিই। ক্ষুণ্ণবৃত্তি করে ক্ষুণ্ণমনে খানিকক্ষণ হাড়ের সাথে খুঁনসুটি করি (যদিও মন চাইছে খুনখারাপি করতেই)। বেয়াড়াগুলো আড়চোখে হাসছে, এমনকি আরসালানের আরশোলাটা পর্যন্ত শুঁড় নাড়িয়ে বলছে, ওরে বোকা, কবি বলেছেন - এসেছিস মুরগি খেতে নয় মুরগি হিসেবে (বোধহয় একটু শব্দবিপর্যয় হয়ে গেল)।

নামিল আঘাত। এইমাত্র! আর কিছু নয়? কেটে গেল ভয়। এবার কি হবে? আমার দুনিয়ায় যে ভয় পাবার, বিস্ময় জাগার, রেগে ওঠার, কেঁদে ভাসানোর, চেটে সাফ করার মত আর কিছুই রইলনা। এক ছিল আরসালান, সেও গেল পেটে। তবে ? বাসনার বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়, ওরে আয়!

যা ত্রী

শংকর

“আরে রাখুন মশাই আপনার ইউরোপ আমেরিকা । ওদেশে কি গরুতে ঘাস খায়না, নাকি কেরোসিনে ট্রেন চলে, যতসব! জেনে রাখুন, এই দেশে আছেন বলে এখনো বেচেবত্তে আছেন । আপনার মশাই যা পানের পিক ফেলার অভ্যেস, আমেরিকা হলে এতদিন পরজন্ম অব্দি হাজতে পুরে দিত ।”

তেজুদার ঝাঁঝালো জবাবে খানিক বিপর্যস্ত হরিপ্রসাদ । “খালি এসব দেখলে হইব! ওদের উদ্যোগটা দেখো, পরিশ্রমটা দেখো ! তোমারে যদি আজ বলি নিজের ঘর বাড়ি সব ছাইড়া তিনশো বছর পুত্র পৌত্রাদিক্রমে স্কটল্যান্ড এর অজ পাড়াগায়ে বরফ কামড়ে পড়ে থাকো, তুমি পারবা? অতো সোজা হইলে আমি নিজেই কবে সিংহল বিজয়ে বেরোতুম । কলজের জোর চাই বুঝালা, এদেশের মাটিতে ও ফল ফলেনা ।”

আটটা পঞ্চাশের কল্যাণী সীমান্ত লোকাল । সাত নম্বর বগির চার নম্বর গেট । প্রবল জনরোল । এপার থেকে ওপার অদৃশ্য । নিত্যযাত্রীর নৈমিত্তিক মুখরতা ।

অশ্বিনীবাবু রাইটার্সের বয়স্হ সেজবাবু । তিনি এবার গলা খাকারি দিয়ে বলে উঠলেন – “ একটা কথা কিন্তু আপনাদের মানতেই হবে । ব্রেনপাওয়ার বলে যে জিনিসটা, অর্থাৎ কিনা ট্যালেন্ট, সেটা কিন্তু আমাদের থেকে ধার নিয়েই ওদের চলে । এদেশে এখনও আর যাই হোক, ব্রেনি ছেলেমেয়ে প্রচুর । এইতো আমার ভায়রাভাই এর ছেলেটা গতমাসই গেল টেক্সাস । রিসার্চের দিকটা তো ইন্ডিয়ানরাই দেখছে ওখানে ।”

তেজুদা ক্ষিপ্ত - “হ্যাঁ, সব বাছাধন টেক্সাসে গিয়ে নোবেল পাবে । আনন্দবাজারে সাইড কলামে লিখবে 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত' । আর যদি বাঙালি হয় তবে তো কথাই নেই – বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার হাঁড়ি বাংলার তাড়ি সব একাকার করে দেবে । সাত তাড়াতাড়ি ভারতরত্ন, সম্বর্ধনা, বোলপুরে সাইকেল সমেত ছবি, রাইটার্সে হাফ ডে । অশ্বিনী বাবুর তো সবার আগে চেয়ার ফাঁকা ।”

“চরিত্রবল চাই, চরিত্রবল” - হরিদার আক্ষেপ - “না হইলে আর সব বৃথা । চাই সাহস বিস্তৃত

বক্ষপট, জিতেদ্রিয় উর্দ্ধরেতা পুরুষসিংহ । দেশটাকে এক্কেবারে ধইরা নাড়ায়ে দিতে হইবা।”

অজয় সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে । সে আর থাকতে না পেরে বললো - “হ্যাঁ আপনি অনেক নাড়িয়েছেন, এবার থামেন । ছেলেপিলে সব দিনরাত নখে নখে ঘষবে আর বেলপাতা খাবে । ইউরোপ আমেরিকা হতে গেলে আগে এসব ভন্ডামো গুলো মন থেকে বার করুন ।”

তেজুদার ফোড়ন - “হ্যারে অজয় তুই আবার জিতেদ্রিয় হয়ে যাসনি । তোর তো এখনও বিয়েই হলনা ! হরিদা, অজয়ের যা মতিগতি, এ শিওর গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা বৌমা ঘরে আনবে ।”

“এই এই - এটা ফ্যামিলি ট্রেন, লিমিট ক্রস করবেনা” - অশ্বিনী বাবুর ধমক - “তাছাড়া আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি বিলেতে গিয়ে ভালো কাজ করে তো আপনাদের এত ইয়ে কেন? এখানে থাকলে তো খালি চলছেনা চলবেনা করতো ।”

এবার তেজুদার পালা - “হ্যাঁ আমরা তো খালি চলছেনা চলবেনা করেছি । আর আপনারা তো পরিবর্তন এনে একেবারে চলাচলমিদং করে ছেড়েছেন । দেব নাচছে দেবী নাচছে কদমতলায় শাহরুখ খান । যতসব!”

“সব ব্যাপারে পলিটিসাইজ করেই বাঙালির কিছু হইলনা” - হরিদা উত্থিত - “একটা কিছুতে শ্রদ্ধা নাই, ডেডিকেশন নাই, খালি মড়া দেশ নিয়া শকুনের মতো ছেঁড়াছেঁড়ি । একটা ইয়াং ছেলে বিদেশে গিয়ে রিসার্চ করছে, কোথায় তাকে একটু সাপোর্ট করেন তা নয়!”

“কি রিসার্চ করছে তা আর জানিনা !” - অজয়ের টিপ্পনী - “ওখানে আবার ইন্ডিয়ানদের হেবি ডিমান্ড । ওরা বলে ব্রাউন কারী, বুঝলেন তো !”

“তুমার এত সাধ তো তুমিই যাওনা কেন !” - হরিদা রাগত ।

অজয় কথা ঘোরাল - “অশ্বিনীবাবু - এবার পিকনিকের জন্যে একটা ভালো স্পট দেখুন না ! আমরা এতজন আছি । ভালো কথা বলছি, রোজ ভ্যালি মন্দারমণি। একখানা এসি বাস বুক করুন দেখি । সবাই মিলে উইকেন্ড কাটিয়ে আসবো ।”

“হ্যাঁ তুমি খাবা মাল আর আমরা পোঁ ধরতে যাবো । কোনো ভদ্রলোকের বেটা মন্দারমণি যায়না, বুঝলো! অশ্বিনীবাবু আপনি হাজারদুয়ারীর দিকে এখান গেস্ট হাউস কি বাংলো

দেখেন। বেস্ট ডেস্টিনেশন।”

“কেন সুন্দরবন কি দোষ করলো?” - তেজুদার প্রশ্ন - “গত দুবছর ধরে বলছি - কি জিনিস মিস করছেন আপনারা বুঝতে পারছেননা! সবাই মিলে দুদিন দুরাত একটা লঞ্চ বুক করবো। ক্যানিং থেকে বেরিয়ে কাকদ্বীপ নেতীধোপানী ঘুরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আসব।”

অশ্বিনীবাবুই মুখ খুললেন - “তাহলে ওরা থাক, আমরা বুড়োরাই চলুন দুদিন রায়চকে গঙ্গাপারের হাওয়া খেয়ে আসি। আমাদের সাথে পিকনিক কি আর ওদের ভাললাগবে!”

“এক্সেরে ঠিক কয়েছেন অশ্বিনীবাবু” - হরিদার সমর্থন। “একখানা শান্ত নিরিবিলি জায়গা দেয়ন। রায়চক চলবে, খুব চলবে। এই অজয়টাকে নিয়াই যত সমস্যা, যেখানে যাবে হাঙ্গাম পাকাবে।”

দমদমে ট্রেন থামল। ভিড় অর্ধেক ফাঁকা হয়ে গেল। তেজুদা আবার শুরু করলেন - “তাহলে সুন্দরবনটাই ঠিক তো? অশ্বিনীবাবু কি বলেন?”

“আবার কি হল? আমি বুড়োমানুষ, তোমরা যেখানে নিয়ে যাবে চলে যাব।”

“আহা ওভাবে কেন বলছেন? আপনিই তো আমাদের আশা ভরসা, আমাদের গার্জেন। বরং আপনিই সাজেস্ট করুন না কোথায় যাওয়া যায়।”

অজয়ের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন - “আচ্ছা হরিদা, মন্দারমণি নিয়ে আপনার এত ইয়ে কেন বলুন তো? ইয়াং ছেলেদের দেখে খুব জ্বলছে না? মন থেকে আগে ওসব পাপচিন্তা বার করুন, তারপর কথা বলবেন। সবাই আজকাল ফ্যামিলি নিয়ে মন্দারমণি যাচ্ছে, আপনার খালি চুলকানি!”

“ই্যা তুমি দেখে আওগে যাও কি র্যালা চলছে।” - হরিদার ফ্লোভ - “আচ্ছা তোমার এত ইন্টারেস্ট কেন কও দেহি! খাবা তো কখান বিয়ার, তা ঘরে বসে খাওনা বাপ, কে মানা করছে? কোন মহাকাব্য লিখবা মন্দারমণি গিয়া? দেখেন অশ্বিনীবাবু, আপনাদের এহনো বলছি, মুর্শিদাবাদ সফরটা এ বছর সেরে ফেলেন। জীবন্ত ইতিহাস দেখে আসেন।”

তেজুদা অধৈর্য্য - “এইজন্য কোন ডিসিশন হয়না। সবাই নিজের নিজের ঝোল টানছে। ইতিহাস মারাচ্ছেন! সুন্দরবনের জ্যাস্ত বাঘ ছেড়ে মিউজিয়ামে গিয়ে সিরাজের পিকদানি আর ক্লাইভের টুথপিক দেখবেন!”

“ও তেজুদা, ট্রেন শিয়ালদা ঢুকে গেছে খেয়াল আছে?” - অজয় উঠে দাঁড়াল।

“অজয় তোর সবেতে তাড়াতাড়ি” - জানলার দিকে মুখ করে তেজুদার উক্তি - “আগে

কামরা ফাঁকা হোক, ধীরেসুস্থে নামবি, তা নয় খালি তাড়াহুড়ো । বস – এখনো পাঁচ মিনিট ।”

শূন্য কামরা । চার আগন্তুক । ট্রেনের পরিচয় । ট্রেনের আড্ডা ক্রমে ঘরে ছড়িয়েছে । নিত্যকার একসাথে ওঠাবসা নয়, অফিসের পাশাপাশি টেবিল নয়, তাই বন্ধুত্ব অটুট ।

“অজয় আজ কিসে ফিরবি? পাঁচটা পঞ্চাশ পাওয়া যাবে?” - তেজুদা উঠতে উঠতে প্রশ্ন করলেন ।

“না তেজুদা, আজ দেরী হয়ে যাবে । কাল দেখা হবে”- অজয় নেমে হাঁটা দিল । তেজুদা আর অশ্বিনীবাবুও ট্রেন থেকে নেমে জানলায় হরিদার সামনে গিয়ে বললেন - “তাহলে হরিদা, আজও পিকনিক স্পট ঠিক হলনা ! ডিসেম্বার তো এল বলে!”

“কিছু একটা তো করতে হইব! কোথাও তো একটা যেতে হইব । আমি বলি কি, অজয় বাচ্চা ছেলে, ওর কথাই থাক । তেজু তুমি আজ কথা বলে নিও । কালকের মধ্যে ডিসিশন ফাইনাল কর ।”

তেজুদা প্রসন্ন - “বাঃ বেশ । কাল কেন, আমি আজই ব্যবস্থা করে ফেলছি । সুন্দরবনটা না হয় আর এক বছর তোলাই থাক । আচ্ছা আজ চলি হরিদা । ”

হরিপ্রসাদ বহুদিন হল রিটায়ার্ড । ট্রেনের নেশা ছোটেনি । তাই রোজ আসা চাই । এই ট্রেনেই বাড়ি ফিরে যাবেন । জানলার ধারে একা বসে রইলেন । অনিত্য সংসারে যতদিন নিত্যযাত্রী থাকা যায় ।